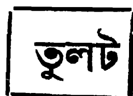
এই বাংলা ওই বাংলা

ড. সব্যসাচী ঘোষদস্তিদার



১৩বি শ্রীকৃষ্ণ লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৪

প্রকাশ : মহালয়া ১৩৯৮, অক্টোবর ১৯৯১
প্রচ্ছদ : গণেশ হালুই

আলোকচিত্র : লেখক
প্রচ্ছদ ও রঙিন ছবি মুদ্রণ : জি. সি. বি
৪৫, অরবিন্দ সরণি, কলকাতা ৫

মালবিকা ভট্টাচার্য। ভুলট, ১৩বি শ্রীকৃষ্ণ লেন, কলকাতা ৪
কর্তৃক প্রকাশিত ও সিকদার প্রিণ্টার্স ১৫এ নলিন
সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৪ থেকে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

ঘোষদস্তিদার বাড়ির দাদা, বৌদি, মেজদা, মেজবৌদি.
দিদি, জামাইবাবু. মেজদি ও শৈবালদা
সেনগুপ্ত বাড়ির দাদা, বৌদি, দিদি, ছোড়দি,
শ্যামলদা, খোকনদা, সন্ধ্যা বৌদি,
ও
বন্ধুবর তপন ও মীনাক্ষীকে।

সূচীপত্র

ভূমিকা

দুই বংলার ওপরে বিভিন্ন সময়ে লেখা কয়েকটা প্রবন্ধের সঙ্কলন এই বই। বাংলাদেশ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গীয়দের যে অনভিজ্ঞতা, উচ্ছ্বাস ও অজ্ঞানতা রয়েছে তারই কয়েকটা দিক নিয়ে এগুলো লেখা। বার বার চেষ্টা করেছি, সেই দেশের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে। তাই অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই সঙ্কলনের সঙ্গে যোগ দিয়েছি 'যদি বেড়াতে যান' নামে কয়েকটা লেখা। যে লেখাগুলো বাংলাদেশকে জানতে উৎসাহীদের সাহায্যে আসতে পারে।

লেখাগুলো বিভিন্ন সময়ে লেখা এবং দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার ফলে কিছু ফাঁক বা পুণরাবৃত্তি হয়ে থাকতে পারে। এছাড়া ইংরেজি থেকে বাংলা হরফে লেখার সময় কোনো কোনো নাম ভুল লেখা হতে পারে যেমন—ইংরেজি একই বানানে বাংলায় 'মহম্মদ', 'মুহম্মদ', 'মোহামেদ' লেখেন ; অনেকে 'মুখার্জি', 'মুখার্জ্জি' ; 'কানাডা', 'ক্যানাডা', 'কেনাডা' ; 'রসীদ', 'রসিদ', 'রশীদ', 'রশিদ' ইত্যাদিও ব্যবহার করে থাকেন। তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

দাদার উৎসাহ ও বন্ধুবর তপন দাসের অসীম উৎসাহ ও দীর্ঘ সময়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া এই বই প্রকাশ সম্ভব হতো না। বিশেষ করে তপনের সাহায্য লিখে বোঝান যাবে না। বইটি প্রকাশনার পূর্বে বিভিন্ন পরামর্শদানের জন্য সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জন ঘোষাল মহাশয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়া নানা সময়ে বিভিন্ন মূল্যবান উপদেশের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই বন্ধুবর শ্রীশুভব্রত সেনগুপ্তকে। ধৈর্য সহকারে মূল পাণ্ডুলিপির ভাষাগত ও ব্যাকরণগত ভুল সংশোধনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান ভূতপূর্ব শিক্ষক শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য মহাশয়কে। এই বইয়ে রঙিন ছবিগুলো ছাপাতে সাহায্য করার জন্য স্টেট ইউনিভারসিটি অব নিউইয়র্ক, ওল্ড ওয়েস্টবেরিজ ক্যাম্পাসকে ধন্যবাদ জানাই।

পুত্র শুভ, কন্যা জয়ীতা ও স্ত্রী শেফালীর উৎসাহ ছাড়াও তারা সর্বত্র এবং সবসময়ে একসঙ্গে না গেলে অনেক কিছু উপলব্ধি করতে পারতাম না। অচেনা, অজানা গ্রামে-গঞ্জে, শহরে, ট্রেনে, প্লেনে, ষ্টিমারে, প্ল্যাটফর্মে রাত কাটাতে এক-বারও দ্বিধা করেনি তারা।

লেখাগুলো লিখতে শেফালীর আলোচনা, সমালোচনা, বিভিন্ন উপদেশ অনেক সাহায্য করেছে। এই লেখাগুলোর মধ্যে শেফালী ঘোষদস্তিদারের একটি প্রাসঙ্গিক লেখা 'বাংলা স্কুল : উভয় সঙ্কট' প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য আলাদাভাবে গভীর

কৃতজ্ঞতা জানাই তাকে। গ্রামে-গঞ্জে, পথে-ঘাটে অনেক অচেনা অজানা নানা লোক যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা।

কৃতজ্ঞতা জানাই 'ভূর্জপত্র'-র শিবনাথ পাল মশাইকে। এই গ্রন্থ প্রকাশে যিনি সেতুবন্ধ হিসেবে ছিলেন। ধন্যবাদ জানাই সিকদার প্রিন্টার্সের সুবীর সিকদার ও তাঁর সকল কর্মীকে। সুদূর পার থেকে শুভেচ্ছা রইল 'তুলট'-এর প্রতি। যে প্রকশনার সূচনা হলো এই গ্রন্থ দিয়ে। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ভাস্কর ভট্টাচার্যকে।

মুখবন্ধ

কলকাতায় ছোটবেলা থেকেই 'দেশ', পূর্ববাংলা, পূর্ব পাকিস্তান, ও পরে বাংলাদেশ সম্পর্কে একরকমের ধারণা নিয়ে বড়ো হয়েছি। সেটা যেন সবটাই ভালো। আমি নিজে যদিও জন্মগত কারণেই কলকাতাকেই 'দেশ' ভাবতাম, ও আর পাঁচটা কলকেতিয়ার মতো মোহনবাগানকেই সমর্থন করতাম, আমার বাঙাল স্বজনদের ইস্টবেঙ্গল সমর্থনের বদলে। তবে পারিবারিক নামের গুণে আমার 'দেশ' কলকাতা বলাতে অনেকে শুধরে দিয়েছেন, এমনকি ১৯৯০তে সুদূর আমেরিকার শিকাগো শহরেও। পরে ওই বাংলার ওপরে লেখা বই ও প্রবন্ধ পড়ে সেখানকার সমাজ ব্যবস্থার একটা ধারণা হয়। তারপর বিদেশে, আমেরিকায় সে দেশের লোকেদের সঙ্গে পরিচয় হয়, যাঁরা সেটাকে শুধু 'দেশ'ই বলেন না, সেখানে থাকেনও। এবং তাঁদেরই আমন্ত্রণে বাংলাদেশ যাওয়া শুরু করি। এই লেখাগুলো সেই অভিজ্ঞতা থেকেই লেখা। প্রায় প্রত্যেকবারই আমাদের মেয়ে জয়িতা ও ছেলে শুভ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরে, এবং শুভর ১০ বছর, ও জয়িতার ১১ বছরের মধ্যেই ওদের অন্তত তিনবার বরিশাল, চারবার ঢাকা, এছাড়া কুমিল্লা থেকে যশোর ঘোরা হয়ে যায়।

১৯৮৫তে দুর্গাপুজোর ঠিক আগে বাংলাদেশ ঘুরে আসার পর-পরই আমাকে বেশ কয়েকজন প্রবন্ধ বা গল্প লেখার জন্য বলেন। আমাদের সেখানে তোলা মুভী ও ফটো দেখার উৎসাহ ও লোকেদের প্রশ্নবান শুনে গল্পর বদলে পাঠগত, অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধ লেখার সিদ্ধান্ত নিই। উৎসাহ বোধহয় আরও বাড়ে তার কারণ আমি ১৯৮৫তে ঘুরে আসার অল্প ক'দিন পরেই ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাবা ছিলেন বোধহয় প্রথম ব্যাচের ছাত্র) জগন্নাথ হলের মর্মান্তিক ঘটনা। বেশ কিছু ছাত্র অকালেই প্রাণ হারান সেখানে, এবং আমি নিজেই তার ক'দিন আগেই আমাদের বন্ধুদের আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ হল দুইই ঘুরে দেখি।

প্রথম আমন্ত্রণ আসে কলকাতার 'বরিশাল সেবা সমিতি'র শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের কাছ থেকে। এই সমিতি ১৯০০ সালের গোড়ায় স্থাপিত। এই

সমিতিতে যোগদেবারও আমন্ত্রণ তাঁরা জানান, এবং আমি তাঁদের জানাই যে এই সমিতি যদি বাংলাদেশের বরিশাল জেলাকে 'সেবা' করেন তবেই আমি যোগ দিতে পারি। অর্থাৎ নামের সঙ্গে কাজেরও যোগ থাকা দরকার। ওঁনারা আরও জানালেন বরিশালের ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য 'বানরিপাড়ার গুহ ঠাকুরতা, বামরাইলের বসু, তারমহলের গুপ্ত, বাটাথোরের দত্ত বংশাবলী ছাপা হয়েছে। গাভার ঘোষদস্তিদার অর্ধেক ছাপা হয়েছে'। এর কিছুদিন পরে আবার সাধারণ সম্পাদক শ্রীবাদলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পাই ছবি, স্লাইড ও মুভী দেখানোর জন্য।

এরপর ১৯৮৬তে আমার দাদা ও অন্যান্য কয়েকজনের উৎসাহে প্রবন্ধ লেখা শুরু করি। বাংলা লেখার অভ্যাস না থাকায় সময় হয়তো একটু বেশিই লেগেছে তাছাড়া ছিল দৈনন্দিন কাজ ও সংসারের চাপ। লেখার একটি মাত্র উদ্দেশ্য আমাদের 'দেশ' সম্পর্কে যে একটা বিরাট ফাঁক বা শূন্যতা তৈরি হয়েছে সেটাকে কমানো। যে কোনো কারণেই হোক আমাদের কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে অনেক তফাত (যার কথা লিখেছি) এবং আমার ধারণা আমরা যদি সেখানে বেড়াতেও যাই তাতেও আমাদের মঙ্গল (তা'ও বলেছি)। এবং সেই জন্যই 'যদি বেড়াতে যান' বলে দু'একটা বেড়ানোর কথা বলা আছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে 'নদী ভ্রমণ' এর ওপর একটা লেখা আমেরিকা থেকে প্রকাশিত ইনটার ন্যাশানাল ট্রাভেল নিউজ-এ 'রকেট ট্রিপ অন দি গ্যাঞ্জেস' নামে আমার এক লেখা ছাপে (মার্চ ১৯৮৫ পৃ. ৩২-৩৩)। এটাই নাকি তাদের প্রথম বংলাদেশের ওপর ভ্রমণ-সংক্রান্ত লেখা। এরপর কলকাতার 'অনুশীলন সমিতির' শ্রীমাখনলাল দাশগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'অনুশীলন বার্তা'-য় কয়েকটা লেখা ধারাবাহিক ভাবে ছাপে। মূল লেখা থেকে অনেক ছোট আকারে। লেখাগুলো হলো 'বাংলাদেশে' (সেপ্টেম্বর ১৯, ১৯৮৭), 'কলকাতা থেকে ঢাকা-বরিশাল' (অক্টোবর ১৭, ১৯৮৭) 'বাঙলা দেশের হিন্দুরা' (অক্টোবর ৩১, ১৯৮৭) ও 'দুই চোখে দুই বাংলা' (নভেম্বর ১৪, ১৯৮৭)। এর জন্য পান্নালালবাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এছাড়া কলকাতার দৈনিক পত্রিকা বর্তমান 'বিদেশে বাঙালী' নামে একটা ছোটো রচনা ছাপে (নভেম্বর ৯, ১৯৮৭)। এরপর নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পাক্ষিক সংবাদবিচিত্রা 'উত্তর আমেরিকার (বাঙালী) সম্মেলন' ও 'উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলনে'র সময় 'দুই চোখে দুই বাংলা' পুনর্মুদ্রণ করে (জুলাই ৩১, ১৯৮৮)। এছাড়া 'বিদেশে বাঙালী'ও পুনর্মুদ্রিত হয় (জুলাই ১৩, ১৯৮৮)।

দুদেশের লোকের হাতে এই লেখা যাওয়ায় অনেক আলোচনা সমালোচনা পাই। অনেকে দেশের মতো আবার 'ছবি দেখার' উৎসাহ দেখায়। এই ছাপার জন্য সংবাদ বিচিত্রার ডঃ রনজিৎ দত্তকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশি এক (অচেনা) ডাক্তার (হিন্দু) যিনি সেখানে স্কুলে থাকার সময় পশ্চিমবাংলায় আসেন ও পরে বিদেশে আসেন এবং এক চিঠিতে জানান '...আপনার লেখাতে আবার দেশের কথা মনে পড়ে গেল। দেশে যেতে অনেক শংকা হয়। তবে কার পাপে কে ভুগছে তা' বুঝে উঠতে পারছি না।..." বাংলাদেশের এক বামপন্থী পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক জানান "আপনার সঙ্গে সর্বকিছুতে একমত না হলেও আপনি যে দুদেশ নিয়ে ভাবছেন এটাই ভালো লেগেছে। আরও ভালো লেগেছে যে দুদেশের লোকেদের এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে বলেছেন।"

১৯৮৮ এর গ্রীষ্মে 'ওয়েস্টবেঙ্গল হেড মাস্টারস অ্যাসোসিয়েশন' এর সেক্রেটারি সম্পাদক ও মাসিক পত্রিকা বুলেটিন অব দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল হেডমাস্টারস অ্যাসো-সিয়েসনের সম্পাদক শ্রীসূর্যাংশু ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং উনি শুধু পশ্চিমবাংলার কয়েকটা বিষয়ের ওপর লিখতে অনুরোধ করেন। সূর্যাংশুবাবুর সঙ্গে একাধিকবার এবং ১৯৮৯ এর অগাস্টে তাঁদের অফিসেও কিছু আলাপ আলোচনা হয়। ওনারা তাঁদের মাসিক পত্রিকায় ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯এ 'এন ওপেন লেটার : সামকনসার্নস্ অ্যাবাউট আওয়ার এডুকেশনাল সিস্টেম' ছাপে। এবং ১৯৯০ মার্চ-এ 'বাঙালীর এ্যামনেশিয়া : স্মৃতিলোপ ব্যাধির প্রতিকার' দরকার ছাপে। এটা দুই বাংলাতেই আমাদের স্মৃতি থেকে অনেক কিছুই লোপ পাওয়ার উপরে লেখা। এই দুটো লেখা ছাপার জন্য শ্রীভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু পশ্চিমবাংলা ও ভারতের বাঙালিদের, বাংলাদেশীয় বাঙালিসহ, বাংলাদেশ সম্পর্কে একাধারে অজ্ঞতা ও উচ্ছ্বাসে সত্যিই অবাক হই। বাংলাদেশের লোকেদের কলকাতা, পশ্চিমবাংলা ও ভারত সম্পর্কে এতটা অজ্ঞতা নেই। এই ব্যাপারেই কলকাতার 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে দুই বাংলা নিয়ে লেখার কথা হয়।

'দেশ' পত্রিকায় 'এই বাংলা' নামে লেখা ছাপা হয় (অগস্ট ১৯৮৯)। লেখাটা শুরু করি ডিসেম্বর ১৯৮৮ ও শেষ করতে কয়েক সপ্তাহ লাগে। এটা লেখা ও ছাপার মধ্যে তিনবার বাংলাদেশ ঘোরা হয়ে যায়—দুবার ইচ্ছাকৃত ভাবে এবং একবার বিমান বাংলাদেশ এয়র লাইন্স এর কৃপায়। একবার ফ্রাঙ্কফুর্ট (জার্মানী) থেকে বিমানে কলকাতা আসার সময় ফ্লাইটের সময় পালটানোর ফলে প্রায় একদিন ঢাকা শহরে। সেই সুবাদে বন্ধুদের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা-সাক্ষাৎ। এরপর

একবার প্ল্যান অনুযায়ী যাই একটি রামকৃষ্ণ মিশনের অনাথ আশ্রম দেখতে, যারা প্রায় বহুবছর ধরেই আমাদের আমন্ত্রণ জানায়, এবং অনেকদিন ধরেই প্রায় আত্মার সম্পর্ক হয়ে গেছে (যদিও এই প্রথম দেখলাম)। অন্যবার আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশোনা এবং বই-পত্র কেনার জন্য। সেই সুবাদে ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল অনেক জায়গায়ই দেখা হয়ে যায়। যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাদের মধ্যে বাংলাদেশের ধর্মমন্ত্রী নিজামুদ্দীন আল-আজাদ, ভূমিমন্ত্রী সুনীল গুপ্ত নির্বাচিত উপজেলা (আগের থানা), উপজেলা চেয়ারম্যান কালিদাস বড়াল, পশ্চিমবঙ্গের আইন মন্ত্রী আ. কাইয়ুম মোল্লা, স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শূর, বিধানসভার বিরোধী দল নেতা আবদুস সাত্তার। এদের সাক্ষাৎকার আমেরিকার 'সাইথ এশিয়া ফোরাম কোয়াটারলি' তাদের ফল ১৯৮৯, উইন্টার ১৯৯০ ও স্প্রিং ১৯৯০ ছাপে। 'দেশ' পত্রিকায় লেখাটা বেরনো নিয়ে একটু লেখা দরকার। জুলাই ১৯৯০তে সম্পাদক সাগরময়বাবুর সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু তখনও জানতাম না কবে লেখাটা ছাপা হবে। আমাদের বন্ধুদের আমন্ত্রণে আমরা সপরিবারে যখন দিল্লি থেকে পাকিস্তান (লাহোর) রওনা হচ্ছি ঠিক তার অল্প আগে দিল্লিতে আমার জামাইবাবু দেশ পত্রিকা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে 'দেখো তো, এটা তোমার ?' লেখাটা সেই প্রথম দেখা, এবং তখন তাড়াহুড়ায় পড়ারও সময় হয়নি। লেখাটা পড়ি দিল্লি থেকে কলকাতা আসার পথে ট্রেনে। এই লেখা সম্পর্কে নানানজনের কাছ থেকে নানান মন্তব্য শুনি। লোকেদের কথা শুনে মনে হয় আমাদের অনেকের মনের কথা, বাইরের কথার মধ্যে তফাৎ অনেক।

সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশ পত্রিকায় অনেকগুলো বাদ প্রতিবাদ বেরয়। এছাড়া বাংলাদেশে প্রকাশিত কিছু দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকেও। এর মধ্যে উল্লেখ্য আহমেদ হুদা-র উত্তরণে লেখা 'বঙ্গভূমি আন্দোলন, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের হিন্দু সমাজ ইত্যাকার প্রসঙ্গ' (সেপ্টেম্বর ৮৯), ও পুলক গুপ্তর খবরের কাগজ পত্রিকায় লেখা প্রসঙ্গ : 'ওই বাংলা-এই বাংলা' (অক্টোবর ১৯৮৯)। আরও কিছু ডান, বাম, মধ্য, ও বর্ণবাদী পত্রিকার লেখা কানে এসেছে। এছাড়া বিশেষত বাংলাদেশ থেকে এত চিঠিপত্র পেয়েছি যে তাতে হতবাক। এর মধ্যে অনেকে লিখেছেন তাদের নাম ও ঠিকানা ছাড়া। লেখাটা লিখেছিলাম আমাদের বিশেষত পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুদের অন্তর্দ্বন্দ্ব (কনট্রাডিকসন) ও ডবল স্ট্যাণ্ডার্ড নিয়ে। তবে এই লেখার আলোচনা সমালোচনা ও লোকের ব্যক্তিগত মতামত ও চিঠিপত্র দেখে মনে হয় সেখানেও এই

অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ডবল স্ট্যাণ্ডার্ড-এর দোষে দুষ্ট। এবং সেদেশে সংখ্যাগুরু-লঘুর মানসিকতায় তফাৎ বোধহয় খুবই বেশি। এক খ্যাতনামা সাংবাদিকের ভাষায় 'সংখ্যালঘু মানসিকতা সম্পূর্ণ আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যেতে পারে'। তাহলে দুই বাংলারই অমঙ্গল। পশ্চিমবাংলায় সংখ্যালঘুদের দাবিদাওয়া তুলে ধরার জন্য আমাদের এসটাবলিসমেণ্ট পার্টি কম্যুনিস্ট-কংগ্রেসরা তাদের নির্বাচন প্ল্যাটফর্মের (প্রতিশ্রুতি) মাধ্যমে তুলে ধরেন, তাছাড়া আছে সংখ্যালঘুদের পার্টি ঝাড়খণ্ড, মুসলিম লীগ, গোর্খা লীগ, জি. এন. এল. এফ্, ভারতীয় জনতা পার্টি, হিন্দুমহাসভা ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর থেকে বাংলাদেশে বি. এন. পি. ও জাতীয় পার্টি সেখানে সংখ্যালঘুদের সমস্যা কেউই তুলে ধরার চেষ্টা করেনি। আওয়ামীলীগের একাংশ, ওয়ারকারস্ পার্টি, কমিউনিট পার্টি, ন্যাপ ব্যতিক্রম—এরা অবশ্য পনেরো বছরই বিরোধীর আসনে। এসটাবলিশমেণ্ট পত্রিকা ও সেন্সরশিপের ফলে পত্রিকারাও সুবিধা-অসুবিধা ধরতে সক্ষম হয়নি। এই শূন্য আসন পূর্ণ করতে এসেছে ১৯৮৯ সংগঠিত বাংলাদেশ হিন্দু খ্রিস্টান-বৌদ্ধ-ঐক পরিষদ, তাদের পত্রিকা পরিষদ বার্তা ও তাদের প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তিকা। 'পরিষদ বার্তা' জানার আগেই এই সমস্যা নিয়ে অন্নদাশংকর রায়-এর (বাংলাদেশ) সাপ্তাহিক পরিবর্তন এ লেখা 'পাঠান, অথচ হিন্দু' (জুলাই, ১৯৮৯ পড়ি)। লেখাটা নিয়ে অন্নদাবাবুর সঙ্গে সামান্য আলাপ হয় এবং উনি লেখাটা অমাকে উপহার দেন। ঢাকায় এক উকিল (ব্যারিস্টার) উপহার দেন 'ঐক্য পরিষদের' পুস্তিকা 'সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও নিপীড়নের কিছু তথ্য' (জুন ১৯৮৯)। এতে আছে ১৯৮৯ এর প্রথম তিন মাসের চুয়াত্তরটি ঘটনা। এর পর-পরই ঢাকার মন্ত্রীমশাইরা জানালেন যে 'শত্রু সম্পত্তি আইন'-এর বলে সম্পত্তি আর নেওয়া হবে না বলে সরকার ঠিক করেছেন এবং ১৯৮৪ থেকে প্রায় আট লক্ষ একর জমি যা' নেওয়া হয়েছে তা সংখ্যালঘুদের ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে (এ শুধু জমির হিসাব। এ নির্দেশ কিভাবে কার্যকর করা যাবে সেটা অবশ্য অন্য ব্যাপার)। এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থা নিয়ে লেখা কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'একতা'য় ধারাবাহিক লেখা (জুলাই ২১, ২৮, অগস্ট ৪, ১১, ১৯৮৯) এক সাংবাদিক দিলেন। পরে চট্টগ্রামে 'শত্রু সম্পত্তি আইন' ও তার ব্যবস্থাপনার ওপরে লেখা দুটি মূল্যবান বই দুই লেখক উপহার দিলেন। প্রথমটি শ্রীমৃদুলকান্তি রক্ষিত-এর লেখা 'দি ল অব ভেস্‌টেড প্রপার্টিস ইন বাংলাদেশ' (ডিলাক্স প্রিণ্টিং প্রেস, চট্টগ্রাম, ১৯৮৯), এ মহঃ সামসুল হক রচিত 'ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা'

(বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৮৯। এখানে শুধু একটা বিভাগ 'শত্রু বা অর্পিত সম্পত্তি আইন' নিয়ে আলোচিত)। এতৎ সত্ত্বেও মনে হয় না সমস্যার দুদিকের শাসক শোষক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মধ্যে তেমন কোনো প্রতিফলন হয়েছে।

শ্রীআহমেদ হুদা লিখেছেন 'আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে', আবার বাংলাদেশ থেকে এক এডভোকেট লিখেছেন '···গোগ্রাসে পড়ে নিই। খুব ভালো লিখেছেন। দরদ দিয়ে, অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে, বাস্তবতার নিরিখে ঐ চমৎকার নিবন্ধটি লেখার জন্য·· ধন্যবাদ··· !' এক অচেনা (হিন্দু নামধারী) অধ্যাপক চিঠিতে জানান '···মূল দায়িত্ব এড়িয়ে. খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েই তো পনের আনা মানুষ জীবন কাটায়। দেখেও দেখে না। অজুহাত খাড়া করে কেবলই দায়িত্ব দূরে ঠেলে দেয়। সরাসরি যা আপনার দায়িত্ব নয় এমন এক দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে নিয়ে যেটুকু আপনি করেছেন তার জন্য অন্তত দু'এক জন ভুক্ত-ভোগী হলেও আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, একথাটা আপনার জানা দরকার'। আমি অবশ্য কোনো কিছুই 'কাঁধে তুলে' নিতে চাইনি. এবং সেইরকম ভেবেও লিখিনি।

এই 'ওই বাংলা, এই বাংলা' 'দেশ' পত্রিকায় ছাপার জন্য শ্রীসাগরময় ঘোষকে অনেক ধন্যবাদ। এরপর উক্ত লেখাটা আবার নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'সংবাদ বিচিত্রা' পুনর্মুদ্রণ করে (১৩ জানুয়ারি ১৯৯০)। পশ্চিম জার্মানি থেকে ছাপা 'খবর' পত্রিকা এই লেখাটিকে পুনর্মুদ্রণ করে তাদের ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৯ ও ২৭ জানুয়ারি ১৯৯০।

আমার এই লেখাগুলো লিখতে সাহায্য করেছে নিজের অন্য কয়েকটা লেখা. বক্তৃতা ও বক্তৃতার সময় আলোচনা। এ ছাড়া অন্যান্য অনেক বই, লেখা, কাগজ ও পুস্তিকা তা বলা বাহুল্য। এই লেখার মধ্যে বিশেষত উল্লেখ্য 'ডেমোগ্রাফিক চেন্‌জেস্ ইন বাংলাদেশ এণ্ড ওয়েষ্ট বেঙ্গল' (বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলায় জনসংখ্যা বিষয়ক পরিবর্তন), শ্রী জন থর্প সম্পাদিত 'উইমেন, ডেভেলপমেণ্ট, ডিভোশনালিজম, ন্যাশনালিজম : বেঙ্গল স্টাডিজ ১৯৮৫' (মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি, ১৯৮৬) বই ; স্টোনি স্টুয়ার্ট সম্পাদিত বই 'সেপিং বেঙ্গলি ওয়ার্ল্ডস : পাবলিক্ এণ্ড প্রাইভেট' বইতে লেখা 'ইলেকটোরাল পারটিসিপেশন অফ ভেরিয়াস গ্রুপস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ১৯৭৭ ও ১৯৮২'। পশ্চিমবংলার বিভিন্ন গোষ্ঠীর নির্বাচনে অংশগ্রহণ মিশিগান স্টেট উইনিভারসিটি, ১৯৮৭ ; শ্রীজিল্লুর খান ও অজিত রায় সম্পাদিত 'বেঙ্গল ইন লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স' বইতে 'বেঙ্গল এণ্ড হার নেইবরস অফ নর্থ ইস্ট ইণ্ডিয়া : সোসাল এণ্ড ইকনমিক রিলেশনসিপ' বইটা

এখনও ছাপাখানায় ; কারমুদায় অনুষ্ঠিত (১৯৮৭) ইণ্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ইণ্টারন্যাশনাল অব কোঅপারেশন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বক্তৃতা 'রিজিওনাল ইকনমিক কোঅপারেশন ইন সাউথ এশিয়া প্রসপেক্টস্ এণ্ড প্রবলেমস্,' আমেরিকার বাকনেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ২১তম বেঙ্গল স্টাডিস কনফারেন্স এ (১৯৮৮) বক্তৃতা 'ক্যালকাটা এণ্ড ঢাকা : কমপারেটিভ চেনজেস এণ্ড সাউথ এশিয়ান পলিটিক্স' এবং অন্যান্য ছোটবড় লেখা ও বক্তৃতা।

এছাড়া ডঃ শেফালী সেনগুপ্ত দস্তিদারের সঙ্গে লেখা বই 'রিজিওনাল ডিস্-পারিটিস্ এণ্ড রিজিওনাল ডেভলপমেণ্ট প্ল্যানিং অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল' ফার্মা কে. এল. এম প্রকাশিত (১৯৯১ কলকাতা) বইও অনেক সাহায্য করেছে।

১৯৯০-এ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ২৪তম স্টাডিজ কনফারেন্স-এ পড়া আমার লেখা 'আনটোল্ড্ (সাকসেস) স্টোরি অফ দি আদার ক্যালকাটা : এ রিফিউজি কলোনী-এ টারসেণ্টিনারি ট্রিবিউট'। ওমাহায় অবস্থিত নেব্রাস্কা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ থার্ডওয়ার্ল্ড স্টাডিজ কনফারেন্স-এ বক্তৃতা 'ডিফারেণ্ট লুক এট বাংলাদেশী পপুলেশন গ্রোথ' এবং ম্যাডিসনে অনুষ্ঠিত উইসকনসিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়ান স্টাডিস কনফারেন্স-এ বক্তৃতা 'ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন এণ্ড লোকেশন অব ন্যাশনাল ইন্স্টিটিউটস এণ্ড অরগানাইজেসন্স ইন ইণ্ডিয়া' উল্লেখ্য। এছাড়া আমেরিকার সাউথ এশিয়া ফোরামের মাসিক আলোচনা সভা, বিভিন্ন বাংলাদেশি সমাবেশ, বাংলাদেশি সম্মেলনগুলোও জানতে বুঝতে অনেক সাহায্য করেছে।

১৯৮৯ সেপ্টেম্বরে এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে সারা বাংলাদেশে শিহরন সৃষ্টি করে। মাত্র এগারো কালি ভিটার জন্য এক অতিগরিব হিন্দু পরিবারের সাতজনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া জেলার (আগের কুমিল্লা জেলার সাবডিভিসন) সদর উপজেলার (আগের থানা) নিদারাবাদ গ্রামে শশাঙ্ক দেবনাথকে ১৯৮৭০-র ১৬ অক্টোবর বাড়ি ছেড়ে ভারতে চলে যেতে বলা হয় ও পরে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তার প্রায় দুবছর পরে ৫ সেপ্টেম্বর স্ত্রী বিরজবালা পুত্র ও কন্যা মিনতিবালা (১৭), সুভাষ (১৩) প্রণতিবালা (১১), সুমন (৭) ও সুজনকে (৩) নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর প্রধান শিক্ষক মোঃ আবদুল মোবারক এঁদের মৃতদেহের সন্ধান পান। ১৭ ঘটনাস্থলে স্বতঃস্ফূর্ত জনসমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংখ্যালঘু ঐক্য পরিষদের (এটি একটি সর্বদলীয় ফোরাম)

সম্পাদক ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক, প্রধান শিক্ষক শ্রীমোবারক, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল হাসেম, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য হামিদুল আলম চৌধুরী ও অন্যান্যরা। এছাড়া বাংলাদেশের জেলা-উপজেলায়ও অনেক সভা-সমাবেশ, প্রতিবাদ মিছিল হয় সংখ্যালঘুদের বিশেষত হিন্দুদের নিরাপত্তা বিধান ও নির্যাতন কমানোর জন্য। কিন্তু কোথায় যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছে। বিরজবালাদেবী ও তাঁর সন্তান সন্ততির স্মৃতি সৌধের মাটি শুকোবার আগেই ১৯৮৯-এর নভেম্বরেই দেশের সংখ্যালঘুদের বাড়ি, ব্যবসা, মন্দিরের উপর সংঘটিত ভাবে আক্রমণ চালান হয়। প্রাণহানি কম হয়, তাই এটা গণহত্যার বদলে গণধ্বংস বলা যায়, পাকিস্তানি আমলেও এমন বড়ো আকারে হয়নি। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় স্বেচ্ছা সেনসরসিপের ফলে পত্রপত্রিকা এ নিয়ে লেখালেখি করেনি, তবে ইউরোপ-আমেরিকার কাগজে এই বিশাল ধ্বংসাত্মক ঘটনার খবরাখবর ছাপে। বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঢাকায় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ধ্বংসের প্রতিবাদ, বিচার ও ক্ষতিপূরণ চেয়ে এক সভা করে এবং প্রায় কয়েকশো ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরের একটা অসম্পূর্ণ তালিকা বার করেন। এই সম্মেলনে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অনেক রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী উপস্থিত ছিলেন। অবস্থার কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে ৯ ডিসেম্বর ১৯৮৯ সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা অনশন পালিত হয়। ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতীক অনশনে ঐক্য পরিষদের নেতাদের সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক দলের অসাম্প্রদায়িক নেতাদের মধ্যে যাঁরা অনশনে শামিল হন তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার ইসতিয়াক আহমদ, এ্যাডভোকেট শামসুল হক চৌধুরী, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, শ্রীফয়েজ আহ্ মদ, শ্রীআবদুল রাজ্জাক, শ্রীমওলানা আহমেদুর, রহমান আজমী, শ্রীনুরুল ইসলাম, শ্রীঅজয় রায়, শ্রীমুজাহেদুল ইসলাম সেলিম, অধ্যাপক আব্দুল হাফিজ, শ্রীখালেকুজ্জাম, শ্রীনির্মল সেন, শ্রীরাশেদ খান মেনন, শ্রীআঃ ফ. ম. মাহবুবুল হক, শ্রীমুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এডভোকেট জাকির আহমদ প্রমুখ। কিন্তু স্বেচ্ছা সেনসারশিপের এর সৌজন্যে সীমানার দুদিকেই এই অসুবিধার ও দুর্ভোগের কথা কেউই বড়ো একটা জানেন না, জানলে অনেকরকম শুধু উল্টোখবরই। সাধারণ ভাবে পত্রিকারা এই ঘটনাকে উপেক্ষা করলেও ঢাকার 'ইন্‌কিলাব' পত্রিকা এই প্রতিবাদ অনশনের নিন্দা ও বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর আপত্তি-নিন্দা ছাপে। আমার ধারণা এতে গোষ্ঠীগত সমাজের দূরত্ব বাড়ছে এবং তাতে বৃহত্তর সমাজের ক্ষতি।

'দেশ' পত্রিকায় লেখা চট্টগ্রামের শ্রীগোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া (৩০ সেপ্টেম্বর ৮৯) এই দূরত্বের কথাই বোধহয় বলেছেন।

দেশে যাঁরা শুভানুধ্যায়ী, শুভেচ্ছাকামী তাঁরাও যেন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যাচ্ছেন। এক সহানুভূতিশীল উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক, যার হাতে অনেক সরকারি ক্ষমতা, তিনিও দুঃখ করে চিঠিতে জানান '...বাংলাদেশে বেশ কিছু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হয়ে গেল। এদেশের হিন্দুরা প্রতিবাদ করতে পারে না বলে বিশেষ ব্যাপক আকার ধারণ করে না।...দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ গোলোযোগ হয়েছে। কিন্তু কোনো খবরই প্রচার মাধ্যমে আসেনি বলে কেউ তেমন কিছু জানে না। এমনকি বাংলাদেশে বসেই অনেকে অনেক খবর জানে না। আমার চাকরির কারণেই সব জানা হয়ে যায়। পরিস্থিতি এখন শান্ত, আপাতত আর কিছু হচ্ছে না বা হবে বলে মনে হয় না।' নাম ঠিকানা ছাড়াই একজন লেখেন '...ঘটনাটা (বিরজবালা)...সামান্য সম্পত্তির জন্য এই কাজ করিয়াছে। সরকার অবশ্য স্টেপ নিয়েছেন। তবে আমাদের সবার অবস্থাই বিরজবালার অবস্থা।...প্রায় সমগ্র দেশেই আগুন,... ধ্বংস, ইত্যাদি চলিয়াছে। কাজটা খুব অরগানাইজড ভাবে করেছে।...মনটা ভাল না।...'

গত ১৯৮৯তে পাকিস্তান যাবার পর আমার ধারণা যে, সেখানে এমনকি পাকিস্তানের মধ্যমনি পাঞ্জাবেও, দেশ ভাগ জনিত সমস্যা ও মানসিকতা নিয়ে একদল লোক যে ভাবে খোলাখুলি আলাপ আলোচনা করতে প্রস্তুত তা' আমরা বাঙালিরা বোধহয় ততটা প্রস্তুত নই। আমাদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ওপর বেশ কয়েকজন লিখতে বলেন। এবং তাঁদের অনুরোধবশত আমি কয়েকটা বড়ো লেখা লিখি যা 'দি পাকিস্তান টাইমস্' (১৯৯০ এপ্রিল) ধারাবাহিক ভাবে ছাপে। কাশ্মীর নিয়ে উত্তেজনার সময়ই লেখাগুলো 'অ্যান ইণ্ডিয়ানস্ জার্নি থ্রু পাকিস্তান — ১ ; ক্রসিং দি বর্ডার ফার্স্ট টাইম্ ; ২. ট্রাভেলিং থ্রু দি পাঞ্জাবী হার্ট-ল্যাণ্ড ; এবং ৩. দি সিমিলারিটিস এণ্ড কনট্রাডিকশন সেখানে আমাদের সমস্যা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে যে ভাবে তারা লেখা-পড়া আলোচনায় প্রস্তুত আমরা বাঙালিরা এ ব্যাপারে একেবারে অপ্রস্তুত। আমরা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চাই। সেইজন্যই হয়তো বা আমাদের সমস্যা জটিলতর হবে নিরসন হওয়ার আগে।

আমাদের নিজেদের অক্ষমতার জন্য আমরা সবাই স্কেপগোট অর্থাৎ ছুতো, খুঁজি। ১৯৮৯তে ঢাকা-চট্টগ্রামে শুনেছি অনেকে বলেছেন যে তাঁরা পেছিয়ে যাচ্ছেন, কারণ দেশ 'পাকিস্তানাইজ' হয়ে যাচ্ছে। তার ক'দিন পরে পাকিস্তানে শুনেছি

তাদের পেছিয়ে পড়ার জন্য অনেকে দোষী করেন 'বাংলাদেশি মেণ্টালিটি।' তার কারণ ধর্মের দিকে বাংলাদেশিরা ঝুঁকছেন কিন্তু পাকিস্তানিরা বিজ্ঞানের দিকে। এটা ঠিক, পাকিস্তানে যে হারে স্কুল তৈরি ও স্কুলের বিজ্ঞাপন দেখেছি তা' আমার ভালো লেগেছে, এবং তা' আমি আমার লেখায় লিখেছি। কোথাও নতুন মস্‌জিদ তৈরি দেখিনি, আমাদের ওই অল্প দিনের অভিজ্ঞতায়। কলকাতায় শুনেছি তাদের হালের জন্য দিল্লির অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও দিল্লির ইংরেজি ও আমেরিকা ঘেঁষা অপসংস্কৃতি, তবে দিল্লিতে শুনেছি দেশের অবস্থার জন্য কলকাতার লোকেদের কর্মবিমুখতা, কলহপ্রবণ ও পরশ্রীকাতর মানসিকতা। ছুঁতো খুঁজে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে কি ?

'দেশ' ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায়, চিঠিপত্র, সমর্থন-প্রতিবাদ যা লেখালেখি হয়েছে তা অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক, হ্যাঁ প্রতিবাদসহ। এঁনারা যে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন তাতে সবারই মঙ্গল। তবে এই প্রসঙ্গে দুটো ছোট বিষয়ের বোধহয় উল্লেখ করা দরকার। খবরের কাগজে লেখা শ্রীপুলক গুপ্ত, ও 'দেশ' পত্রিকায় লেখা শ্রীমুজতবা হাকিম প্লেটো-র (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৯) লেখা 'সিঁন্দুর পরা' নিয়ে। আমার ধারণা গোষ্ঠীগত দূরত্ব বাড়তে বাড়তে এমন হয়েছে যে ক'দিন আগেও আমাদের মা-বাবারা যে গোষ্ঠীগত তফাতগুলি জানতেন তা আজকাল আমরা হয়তো জানি না, নিজেদের অজ্ঞানতাবশতই। আমি বাংলা-দেশে অনেককেই (মুসলমান) 'টিপ' পরতে দেখেছি, কিন্তু সিঁথিতে 'সিঁদুর' পরতে দেখিনি। আমি বেশ কিছু (হিন্দু-মুসলমান) মহিলাকেও জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরাও আমার অভিজ্ঞতাকে সমর্থন করেছেন। এমনিতেই অনেক হিন্দু 'ভদ্র মহিলা' ও অনেক হিন্দু 'বাংরেজ'রা শখ করে শাঁখা-সিঁদুর পরেন না। তবে 'শখ' করে করা আর 'চাপে' পড়ে করা দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ। আমরা নিজেরাই শুনেছি যে বাংলাদেশে (পশ্চিমবঙ্গ সহ) দাঙ্গার সময় অনেক হিন্দু মহিলা বোরখা পরেছেন ও অনেক মুসলমান মহিলা শাঁখা-সিঁদুর পরেছেন, অনেক পুরুষ ধুতি-লুঙ্গিও পরেছেন। এর সঙ্গে 'শখ' করে পরার যে মূলগত পার্থক্য আছে সেটা আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করব। ধুতি পরার ব্যাপারটাও তাই। ১৯৪৭ এর পার্টিশনের আগে দুই বাংলার দুই সম্প্রদায়ই ধুতি-লুঙ্গি দুইই পরতেন। তবে প্রায় সবারই পোশাকি বা ভদ্রবেশ ছিল ধুতি! আমার বাংলাদেশের দুই (মুসলমান) মেসোমশাই একজন ব্যবসায়ী অপর জন উকিল, দুজনেই জানালেন যে 'পঞ্চাশের গোড়া পর্যন্ত' তাঁরা নিয়মিত ধুতি পরতেন। এখন

অবশ্য সেটা প্রায় 'চিন্তার বাইরে'। ১৯৮৯-এ বাংলাদেশে আমাদের মামাবাবু ধুতি পরেই আমাদের নিতে এসেছিলেন তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাতে যে তাঁর মাঝেমধ্যে অসুবিধাও হয়, সেটাও অবশ্য জানিয়ে ছিলেন। ধুতি পরা 'অস্বাভাবিক' বলেই না ঢাকার রমনার ময়দানে ১৯৯০ নববর্ষ অনুষ্ঠানে কিছু তরুণ ধুতি পরে এলে সেটা একটা 'নিউজ আইটেম' হয় (প্রবাসী আনন্দবাজার, ৫ মে ১৯৯০)। পত্রিকাটি লেখে 'এই পোশাক বাংলাদেশে বড় একটা চোখে পড়ে না। তাই অনুষ্ঠানে এই সাজে কিছু তরুণের আগমন উপস্থিত জনতার দৃষ্টি কাড়ে'। আজ থেকে কয়েক দশক পরে হয়তো আমরা স্বেচ্ছায় সবাই. মেয়ে-পুরুষ, ব্লু-জিন ও ট্যাংক-টপ (হাত কাটা রঙিন গেঞ্জি) বা টি-শার্ট (হাত-ওয়ালা গেঞ্জি) পরবো।

ইতোমধ্যে, নববর্ষের (১৯৯০), আগেই বাংলাদেশে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বই বার হয়। প্রথমটি, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-ঐক্য পরিষদ-প্রকাশিত 'সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও নিপীড়নের কিছু তথ্য : দ্বিতীয় পর্যায়' এবং মতিউর রহমান ও সৈয়দ আজিজুল হক্ লিখিত 'বৈষম্যের শিকার : বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়' (জ্ঞান প্রকাশনী, ঢাকা)। এর অল্প কদিনের মধ্যেই বাংলাদেশে ভারতের 'কাশ্মীর' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে গিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যালঘুদের ঘর-বাড়ি-ব্যবসা-মন্দির প্রভৃতির ওপর আক্রমণ চালানো হয়। আমি মনে করি ভারতের কাশ্মীরীদের সঙ্গে একাত্মতা দেখানো ভালো ও অত্যন্ত প্রয়োজন। তবে দেশে সংখ্যালঘু হত্যা ও নিপীড়নের মধ্যে নয়। তাদের সঙ্গেও একাত্মতা জানিয়েই আন্দোলন চালাতে হবে। নচেৎ এক জায়গায় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সবাক ও অন্য জায়গায় নির্বাক হলে তো ভণ্ডামির দোষে দুষ্ট হব। আমরা যতই দেশের ভেতরে ও দেশের বাইরের লোকজনের, বিশেষত নিপীড়িত লোকেদের হয়ে চিন্তা-ভাবনা-আন্দোলন করব তাতে বাংলার মঙ্গল, বাঙালির মঙ্গল, উপ-মহাদেশের মঙ্গল, বিশ্বমানবতার মঙ্গল। আমার আশা আমরা সবাই যেন এই মঙ্গলই কামনা করি এবং তারই চেষ্টা করব।

ক. বাংলাদেশ রাজনৈতিক

বাংলাদেশে প্রথম

প্রথমেই বলা দরকার যে এই লেখা পশ্চিমবঙ্গীয় হিসেবে কয়েকবার বাংলাদেশে যাওয়ার পর লিখছি, এবং গত এক যুগের বেশি—বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে থেকেই বিদেশে বাংলাদেশিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে তার অভিজ্ঞতা নিয়েও লিখছি। এই মেলামেশা যে মাঝে মধ্যে আড্ডা তা' নয়, তার থেকে অনেক বেশি—যেমন উইকএন্ডে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, বেড়াতে যাওয়া, একে অন্যের বাড়িতে ছুটি কাটানো, এক সঙ্গে অনুষ্ঠান করা, বাংলাদেশ ও ভারতে প্রকাশিত বই ও পত্রপত্রিকার বিনিময় ইত্যাদি। দেশে এক পাড়ায় থাকলেও কাউকে এত ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া ও জানার সুযোগ হয় না। বিদেশে যে সব বাংলাদেশিদের সঙ্গে মিশেছি তাদের অধিকাংশই স্বাভাবিকভাবে মুসলমান। এছাড়া কিছু হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধও আছেন। এবং বাংলাদেশে যখন গেছি তখন বেশিরভাগই আমাদের মুসলমান বন্ধুদের বাড়িতে থেকেছি। অন্য সময় হোটেলে বা হিন্দু পরিবারের সঙ্গে থেকেছি।

সত্তর দশকের গোড়ার দিকে আমাদের বন্ধুর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের পথে পা বাড়িয়েছিলাম, কিন্তু ভিসা নিতে যখন কলকাতায় হাইকমিশন অফিসে যাই তখন লোকের ভিড় দেখেই বুঝেছিলাম যে এ যাত্রায় আর হবে না। ভিড় দেখে আমাদের ভিয়েতনামী বান্ধবী থি উ খিম-এর সাইগনের পতনের আগে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে ভিড়ের বর্ণনা মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন। যাই হোক্ পরে আবার যখনই কলকাতায় আসি তখনি আর ভুল না করে আমেরিকা থেকেই ভিসা নিয়ে আসি। ওখানে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভিসা দিয়ে দেয়।

প্রথমবার যখন ঢাকা যাই তখন কলকাতা থেকে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্‌স, বিমানে, ঢাকা যাই। 'আসলাম আলায়কুম। বিষমিল্লাহীর রাহমানীর রাহীম...' বলে এয়ার হোস্টেস আমাদের স্বাগত জানাল। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকার অন্তত ১৫-২০টা দেশের এয়ারলাইনস্-এ চড়ে এই বোধহয় প্রথম এতটা ধর্মীয় কায়দায় সম্ভাষণ পেলাম। সেখান থেকেই আমাদের আলাদা

সত্তাটা মনে করিয়ে দেয়। আবার যখন ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌সে চড়ি তখন 'নমস্‌কার'টা বাদ দিলে আর সবটাই হিন্দি বা ইংরেজিতে, এমনকি কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি, বা শিলচর থেকে আগরতলা, বা আগরতলা থেকে কলকাতার ফ্লাইটেও। ঢাকা এয়ারপোর্টে বন্ধু কর্নেল রহিম অপেক্ষা করছিলেন এবং তার টয়েটো গাড়িতে ঢাকায় আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। পথে দু-একটা সুন্দর 'স্বাগতম্‌' লেখা তোরণ ছিল--কোনো বিদেশি রাষ্ট্র প্রধানের জন্য। এয়ারপোর্ট থেকে বেরোলেই যে কোনো পশ্চিমবঙ্গীয়ের চোখে ঢাকা নগরী ও বাংলাদেশ তাদের সংজ্ঞাতেই একাধারে 'বাঙালি' ও 'অবাঙালি' মনে হবে। বাঙালি কেন না রাস্তাঘাট, দোকান, গাড়ি, বাস সব কিছুরই লেখা বাংলাতে। যে কোনো তোরণ-এ 'স্বাগতম্‌' ও ব্যানারে বাংলাতে লেখা। আমাদের কলকাতায় ও পশ্চিম-বাংলায় 'করুণাময়ী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' বা 'সিদ্ধিদাতা গণেশ টেলার্স' অবশ্যই লেখা থাকবে শুধু ইংরেজিতে, মাঝেমধ্যে ইংরেজিতে ও বাংলাতে, কদাচিৎ সঙ্গে হিন্দি বা অন্য ভাষায়। আর কলকাতায় ট্রাম-বাসে সবসময়েই ইংরেজিতে এবং তা বুঝতে কত লোকের যে বেগ পেতে হয় সেটা শিয়ালদা, হাওড়া বা বালীগঞ্জের বাসস্টপে গেলেই বোঝা যায়। কলকাতায় যেমন এখনও ট্রামের ফার্স্ট ক্লাসে ইংরেজিতে এবং সেকেণ্ড ক্লাসে বাংলায় লেখা থাকে সেই ধরনের ইংরেজ শাসনের ভালো বা অপমানকর নমুনাগুলো বাংলাদেশে আর নেই। তাই বাঙালি। আর অবাঙালি কারণ প্রধানত পোশাক। গরিব বাংলাদেশি পুরুষরা পরেন সাধারণত লুঙ্গি। ধর্মপ্রাণ কিছুলোক পরেন আরবী ধাঁচের গলাবিয়া আঁচকান ও তাকিয়ো টুপি। ভদ্রলোকেরা পরেন টু-পিস্‌ বা থ্রী-পিস্‌ সুট ও টাই—আমলা, অধ্যাপক থেকে ব্যবসাদার সবাই। আমি রাস্তায় শুধু দুজনকে ধুতি পরতে দেখেছি। বরিশালে বাটাজোব গ্রামের এক বৃদ্ধকে ও ঢাকা রায়ের বাজারের কাছে এক দোকানদারকে। ছোট মেয়েরা সালোয়ার কামিজই বেশি পরে, আর মহিলারা শাড়ি এবং সালোয়ার কামিজ। তবে ভারতীয় বাঙালির তুলনায় বাংলাদেশী বাঙালি মধ্যবিত্ত তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ইংরেজির ব্যবহার অনেক কম করেন। আমাদের থেকে ইংলিস মিডিয়াম ইস্‌কুলে পড়ানোর ঝোঁক বাংলাদেশীদের কিছু কম, তবে ইংলিশ কায়দার ক্যাডেট স্কুলের আকর্ষণ খুবই।

আরেকটা জিনিস বাংলাদেশে গিয়ে প্রথমবারে খুব চোখে পড়েছে সেটা হলো বাইরে থেকে ধনী গরিবের প্রভেদ ও জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম। পোশাক ছাড়াও খাওয়াদাওয়াতে ধনী-গরিবের তফাতটা এসে গেছে। ধনী বা মধ্যবিত্তদের

বিয়ে বা যে কোনো দাওয়াৎ-এ (নিমন্ত্রণ কথাটা একেবারেই ব্যবহার হয় না) বাঁধাধরা খাবার, মাংসের বিরিয়ানী, মোগলাই, চিকেন, টিকিয়া, বোরহানী পানীয় এবং মুখ মিষ্টির জন্য চালের জর্দা। আমরা যেগুলো 'বাংলাখাবার' বলি ও খেতে দিই সেগুলো একেবারেই চলে না। গরিবরা স্বাভাবিকভাবেই বিরিয়ানী-চিকেন ছুঁতে পারেন না, তাঁরা ওই ভাত-ডাল দিয়েই শুরু করেন। সামাজিক কারণে মধ্যবিত্তদের দু-একটা পদ দেওয়ার চেষ্টাও করেন। সিমাই-এর পায়েস ধর্মীয় ও অন্য অনুষ্ঠানেও দেওয়া হয়।

আরও কয়েকটা ছোটখাট ব্যাপারে প্রথমবার চোখে পড়ে তার মধ্যে আছে 'বিদেশি' জিনিসের প্রাচুর্য। যেহেতু বাংলাদেশে খুব কম জিনিস তৈরি হয়, প্রায় সবই বাইরে থেকে আমদানীকৃত—জাপান, সিঙ্গাপুর, ভারত, আমেরিকা, জার্মানি, চীন', ইংলণ্ড সব দেশেরই। তবে এর অনেক কিছুতেই এঁরা বাংলা লেবেল লাগান। দেশে তৈরি হলে তো বটেই। আরেকটা ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হলো 'মীনাবাজার'। এটা হলো মেলা-র নতুন নামান্তকরণ। কলকাতায় যেমন কেউ 'মেলা' কেউবা 'ফেয়ার'-এর আয়োজন করেন, ঢাকায় তেমনি 'মীনাবাজার'।

বাংলাদেশে, বিশেষ করে ঢাকায়, 'হিন্দু এলাকা' বলে কোনো জায়গা চোখে পড়েনি। হিন্দু বলে কোনো পৃথক সত্তাও পাইনি (এর আলোচনা পরে করব)। আমার জন্ম কলকাতা এবং বাংলাদেশে গেছি ভবঘুরে টুরিস্টের মতো যেমন গেছি বেড়াতে আর পাঁচটা দেশে। কিন্তু আমাদের অনেক বন্ধু, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন বিশেষ বিশেষ জায়গার নাম করেছে 'হিন্দু এলাকা' বলে এবং তাদের হয়ে দেখে আসতে বলেছিলেন। যেমন পুরনো ঢাকার নারিন্দা, উয়ারী, শাখারীপট্টি, রায়ের বাজার। কিন্তু কোনো এলাকাই এখন আর হিন্দু প্রধান নেই। এবং যেহেতু হিন্দুরা যখন দেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসেন তখন তাদের বাড়িঘর স্থানীয় মুসলমানরা কেনেন, দখল করেন বা পান, তার ফলে সেই সব জায়গায় যে সব হিন্দুদের ধর্মীয় বা সামাজিক ইন্‌সটিটিউশন ছিল সেগুলো হয় বিলুপ্ত হয়েছে বা তা' হওয়ার পথে। তবে আমার ধারণা একদিকে যেমন কতকগুলো জিনিস হারিয়ে গেছে ও যাচ্ছে, ঠিক সেইসঙ্গেই বাংলাদেশে হিন্দুরা তাদের আইডেনটিটি ও ট্র্যাডিশন সম্পর্কে ভালো ভাবে সচেতন, এবং এগুলো নিয়েই বাঁচার চেষ্টা করছেন বিসর্জন দিয়ে নয়। এদিক থেকে আমাদের চেয়ে তারা একটু 'বেশি হিন্দু' এবং একটু 'বেশি বাঙালি'ও। এখানে বলা দরকার যে আমাদের কিছু লোকের ধুতি পরা

দেখে বাঙালি মনে হলেও কলকাতার লোকজন, দোকানপাট-ট্রাম-বাস-অফিস আদালতে এবং লেখা, হিন্দি সিনেমার ভীড় দেখে বাংলাদেশিদের আমাদের অতিমাত্রায় অবাঙালি মনে হয়। এছাড়া বাংলাদেশ ছাড়লেই ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্, এয়ারপোর্ট, কাস্টমস্, সীমান্তের চৌকি ও পুলিস সবকিছুই তাদের কাছে 'অবাঙালি' লাগে। সত্যি কথা কি বেনাপোল সীমান্ত পেরিয়ে রাস্তা দিয়ে এলে এটা আমাদেরও চোখে পড়বে। সীমান্তের এদিকে রাজনৈতিক দেয়াল-লিখনগুলো না থাকলে যে অন্য এক বাংলাদেশেই আসছি সেটা বোঝার উপায় থাকে না।

অর্থাৎ প্রথমবার গেলে আমাদের মধ্যে যেমন মিল ধরা পড়বে তেমনি অনেক অমিলও চোখে পড়বে।

বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার কয়েকটা দিক

কিছু দিক থেকে বিচার করতে গেলে দেশ ভাগ, যাকে আমরা পার্টিশন বলে থাকি, তা' আমাদের সমাজব্যবস্থাকে আমূল ও অনেকাংশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আমি জানি যাঁরা রাজনৈতিক বিপ্লবে বিশ্বাস করেন তাঁরা এই 'বৈপ্লবিক' কথাটা ব্যবহারে হাসবেন বা ভুল বুঝবেন—তবুও লিখলাম—আশাকরি এই লেখাগুলোর মাধ্যমে কিছুটা স্পষ্ট করতে পারব। যদিও আমূল পরিবর্তন কথাটার ব্যবহারে অনেকে খুশি হতেন। পশ্চিমবাংলা ও অন্যান্য কয়েকটা জায়গায় লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি (পূর্ববঙ্গীয় বা বাঙাল—কথাগুলো একই অর্থে ব্যবহার করছি) এসে বসবাস আরম্ভ করায় এখানে পরিবর্তন হয়েছে ডেমোগ্রাফিক বা জনসংখ্যাজনিত, এবং তার ফলাফল আলোচনা এখানে করছি না। পার্টিশানের পরে বাংলাদেশে (বা পূর্ব পাকিস্তানে) এর থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর ভারতে আসার ফলে সেখানে একটা বিরাট ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত হিন্দুরা যাঁরা সামাজিক অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির ধারকবাহক ছিলেন তাঁরা হঠাৎ করে চলে আসার ফলে ক্ষতিটা বোধহয় খুবই হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের এক বন্ধু, বাংলাদেশি পরিবর্তনের সঙ্গে খুবই পরিচিত এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডাক্তার খন্দকার আমাকে মনে করিয়ে দেন যে তাঁর বরিশালের গৌরনদী থানায় পার্টিশনের আগে দেড় ডজনের মতো হাইস্কুল ছিল এবং পাঁচ-ছটা মেয়েদের হাইস্কুল। কিন্তু পার্টি-শনের পরে এই সংখ্যা অর্ধেকেরও কম হয়ে দাঁড়ায়, মেয়েদের হাইস্কুল প্রায় সবই বন্ধ করে দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকের অভাবে।

১৯৮৪ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ১৯৭৯ সালে বরিশাল জেলায় স্কুলের সংখ্যা ছিল ৫৪৮; ১৯৮১তে এটা কমে দাঁড়ায় ৫৪৭, এবং ১৯৮৩তে সেটা বেড়ে হয় ৫৬৩। বরিশাল জেলার ২৮টা থানার হিসেবে এই গড়পড়তা স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় কুড়ির মতো।[১]

এখানে একটা কথা বলা দরকার যে ভারতে বাঙালিদের, বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু এবং আরও সূক্ষ্ম করে বলতে গেলে বাঙালদের এবং বাংলাদেশে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের মধ্যে আণ্ডারস্ট্যানডিং বা বোঝাপড়ার একটা বিরাট ফাঁক আমার চোখে পড়েছে। সেটা হলো বেশির ভাগ বাংলাদেশি মুসলমান, বিশেষ করে মধ্যবিত্তদের ধারণা যে বাঙাল যাঁরা ভারতে এসেছেন তাঁরা প্রায় সবাই বিনা কারণেই ইচ্ছাকৃতভাবে এসেছেন. কোনো চাপে পড়ে নয়। অর্থাৎ ভারতে বাঙালরা উদ্বাস্তু হয়ে আসেননি, এসেছেন সুযোগ সন্ধানে। এনারা বাংলাদেশকে পরিত্যাগ বা ডেসার্ট করেছেন। আরও মারাত্মক লাগে যখন কিছু বাংলাদেশি ভাবেন যেন বাঙালরা এসেছেন অনেকটা কলোনাইজ করতে। কিন্তু ভারতে যখন বাঙালদের সঙ্গে কথা বলি তারা প্রায় সবাই বলেন যে তাঁরা দেশ ছেড়েছেন অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে এবং 'চাপে পড়ে'। তাঁরা দেশ ছেড়েছেন যখন তারা আর 'থাকতে পারেননি'। দুজনদের মধ্যে এত বড়ো তফাত কেন হলো সেটা ভেবে দেখা দরকার। হয়তোবা আমরা কলকাতা এবং ভারতে বাঙালদের সাফল্যটা তুলে ধরেছি এবং সে নিয়ে লিখেছি (ব্যর্থতা ও কষ্ট কেই বা মনে রাখতে চায় ?) আর বাঙাল উদ্বাস্তুদের থাকার জায়গাগুলোকেও আমরা কলোনী বলেই ডেকেছি (পাড়া বা গ্রাম না বলে)। যেমন বাঘাযতীন কলোনী বা রামগড় কলোনী। তা বলে ভুল বুঝবেন না যে বাংলাদেশে এই চিন্তাধারার অপর দিকটা কেউ জানেন না। সংখ্যালঘু, দেশভাগজনিত অবস্থা, সমাজব্যবস্থা এসব নিয়ে অনেকেই লিখেছেন এবং লিখছেনও। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে নাম করতে হয় বাম ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত শ্রীবদরুদ্দিন উমর,[২] যিনি বেশ কয়েক দশক ধরে পূর্ববাংলার ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার ওপর লিখে আসছেন। আরও নাম করতে হয় ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।[৩] তবে লেখা অনুপাতে লেখার প্রভাব বাংলাদেশি মধ্যবিত্ত ও শাসনকর্তাদের মধ্যে খুব কম।

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থার প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হলো ধনী ও গরিবের তফাত। পশ্চিমবাংলায় বা ভারতে ঠিক এতটা চোখে পড়ে না। মনে হয় ঢাকার মতো নগরীতে কোনো মধ্যবিত্ত নেই—আছে ঠিকই এবং এনারাই আজকের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। পাকিস্তান আমলে বলত যে পাকিস্তন চালাত কুড়িটি কোটিপতি পরিবার (তার মধ্যে একটি শ্রী এ. কে. খান, বাঙালি পরিবার ছিল)।[৪] আজকাল সবাই বলেন যে বাংলাদেশ চালাচ্ছেন একশটি কোটিপতি পরিবার, এবং এনারা প্রায় সবাই স্বাধীনতার পর 'রাতারাতি'

কোটিপতি হয়েছেন। মানে প্রথম দশ বছরের মধ্যেই। উন্নতিশীল দেশের অনেকেই মনে করেন যে কোনো দেশে যদি বেশি সংখ্যায় মধ্যবিত্ত না থাকেন তবে সেখানে হয় দক্ষিণপন্থী অভ্যুত্থান অথবা বামপন্থী বিপ্লব হবে, এবং বহুদল-ভিত্তিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে গেলে মনে হয় এই বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ দিয়ে অন্তত মুসলনান মধ্যবিত্ত ভালোমতো তৈরি হয়েছে। এতে সবাই যে খুশি তা নয়। রেহমান সোভান তাঁর লেখা 'দি ক্রাইসিস অব এক্সটারনাল ডিপেন্‌ডেন্‌স'[৫] বইয়ে এই বিদেশি সাহায্যের নানান দিক তুলে ধরেছেন। ভালো বা মন্দ তা দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করবে। এটা আরও তাড়াতাড়ি হয়েছে বোধহয় ১৯৭৫এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হত্যার পর থেকে।

অনেকে বাংলাদেশে মধ্যবিত্তদের 'কুইক রীচ'—রাতারাতি বড়লোক হওয়ার প্রবণতা ও তার সঙ্গের সামাজিক সমস্যা খোঁজ করতে গিয়ে হিন্দুদের বিনা বাধায় তাদের সম্পত্তি-ভিটে-ব্যবসা অন্যদের ছেড়ে আসায় দোষারোপ করেন। ১৯৭১এর পর বাংলাদেশি মধ্যবিত্ত বিনা পরিশ্রমে উর্দুভাষীদের সম্পত্তি, ব্যবসা, কারখানা পান। আমার ধারণা চোদ্দপুরুষের ভিটেমাটি এবং অনেক পরিশ্রমের দোকান-পাট ছেড়ে আসার ফলে আমাদের মানসিকতারও পরিবর্তন হয়েছে অনেক। আমরা 'রাতারাতি ছন্নছাড়া' হয়েছি, বাংলাদেশের মধ্যবিত্তদের মতো না-খেটে 'কুইক রীচ' হতে না পারলেও আমাদের মধ্যে 'শহুরে জবরদখল' মানসিকতা ঢুকে গেছে। শুনতে খারাপ লাগলেও আমি এটা আমাদের মতো পূর্ববঙ্গীয়দের কথাই বলছি। বৃহত্তর সমাজও এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এবং গ্রামের ভাগচাষী বা ভূমিহীন কৃষকের জমির মালিকানা বা পাট্টার কথা, অথবা কলকাতার বস্তিতে মাথা গোঁজার কথা বলছি না। বলছি না ডমিনিক লাপিয়েরের কলকাতার আনন্দনগর 'সিটি অব জয়'[৬] এর হিউম্যান হর্স রিক্সাচালক-এর আনলাইসেন্সড রিক্সার মালিকানা পাওয়ার স্বপ্নের কথা। আমি বলতে চাই বালিগঞ্জে বাড়ি থাকা সত্ত্বেও রামগড়ে গিয়ে অন্যের জমি জবরদখল বা দুটো জবরদখল প্লট ধরে রাখা। বা ১৯৫৪ সালে শ্যামবাজারে কোনো এক অভাগা আশ্রয় পেয়ে এখন সেই অভাগাই যেনতেনপ্রকারে বাড়িওলাকে বঞ্চিত করার প্রয়াসকেই দরকার হলে পার্টি বা গুণ্ডার সাহায্যে। কিংবা ১৯৬১ থেকে বেলেঘাটায় ২৮ টাকা মাসে বাড়িভাড়া ধরে রেখে, এবং ভাড়া বাড়াবার বিরুদ্ধে দারুণ যুক্তি দেখিয়ে, সল্টলেকে বাড়ি করে বছর বছর লীজ ও ভাড়া বাড়ানোর

মেণ্টালিটির কথাই বলছি। এ ব্যাপারে বিশদ লেখা এখানে প্রয়োজনীয় নয়। সুখের কথা বাংলাদেশে এই কিছু লোকের 'রাতারাতি বড়লোক' হওয়ার প্রবণতাকে সেখানে অনেকেই কঠোরভাবে সমালোচনা করছেন।

অধ্যাপক তালুকদার মণিরুজ্জমান তাঁর বই 'গ্রুপ ইণ্টারেস্টস্ এণ্ড পলিটিক্যাল চেনজেস্ : স্টাডিজ অব পাকিস্তান এণ্ড বাংলাদেশ'-এ পশ্চিমবাংলায় বাঙালিদের কথা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তাদের সাহায্যদানের কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন—

"পার্টিশনের গোড়ার দিকে রিফিউজিদের অধিকাংশ যাঁরা পশ্চিমবাংলায় এসেছিলেন, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ফলে যেটা তাদের শাসক সম্প্রদায় এই সাম্প্রদায়িকতা ম্যানিপুলেট করতেন, তাঁরা সাধারণভাবে ধনী, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত ও জমির মালিক ছিলেন এবং বাংলার সমাজব্যবস্থার পুরোধা ছিলেন। ১৯৭০ সালের মধ্যে এই উঁচু ক্লাসের রিফিউজিরা পশ্চিমবাংলার পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৯০ ভাগ পদ তাঁরা আলোকিত করতেন, এছাড়া ল (ব্যারিস্টারি), ডাক্তারি, ইনজিনিয়ারিং ও রাজ্য সরকারি চাকরির অধিকাংশই এঁরা ডমিনেট করতেন। ১৯৫০ ও ষাট দশকের রিফিউজিরা সাধারণভাবে গরিব ছিলেন—কারিগর, ভূমিহীন কৃষক, ব্যবসাদার ও গরিব চাষী। এনারাই পশ্চিমবাংলার বামপন্থী দলগুলিকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই রিফিউজিরা পাকিস্তানি শাসকবর্গের বদলা নেওয়ার সুযোগ পান।…" (পৃ. ১২৩)[৭]

এই কারণেই ১৯৭১এ কলকাতায় যে তিনটে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি ছিল তার নেতাদের শতকরা ৬০ ভাগই ছিল পূর্ববঙ্গীয়। (পৃ. ১২২)[৮]

মুজিব হত্যার পরের ঘটনা আমাদের প্রায় সবারই জানা আছে। বেশ কিছু উত্থান-পতন, খুন-জখমের পর আসেন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়া-উর-রহমান। শ্রীজিয়া-উর-রহমান নিজের ভিত শক্ত করার জন্য এবং মুজিবের আনপপুলারিটির কারণের থেকে নিজেকে আলাদা করার জন্য 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের' গোড়াপত্তন করেন। এর কতকগুলো দিক হলো অলিখিতভাবে ভারত-বিরোধিতা করা, বাংলাদেশে ঘৃণিত ইসলামপন্থী লোকেদের আবার পুনর্বাসিত করা। ভারত সরকারের বিরোধিতাতে খুব চিন্তিত হবার কারণ নেই। কিন্তু বাংলাদেশে অনেকের কাছে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু বিরোধিতাই অন্য রূপ। লণ্ডনের 'সাগর পারে' নিউইয়র্কের 'সংবাদ-বিচিত্রা' ও ঢাকার 'সন্ধানী'তে*

'বাংলাদেশি বনাম বাঙালি' ও অন্যান্য লেখায় ডাঃ খন্দকার আলমগীর এই 'জাতীয়তাবাদী' সমস্যার কমপ্লেক্স দিকগুলো তুলে ধরেন।[৯] যেমন ভারতেও পাকিস্তান সরকার বিরোধিতা অনেকের কাছে ভারতীয় মুসলমান বিরোধিতারই অন্য রূপ। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার বাংলাদেশিরা সাধারণভাবে ভারতের রাজনীতি, পশ্চিমবাংলার বাম-দক্ষিণ রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান এবং আমাদের থেকে অনেক বেশি খোঁজখবর রাখেন (তাদের দেশ সম্পর্কে)। এই রকমই একটা তুলনামূলক ও পশ্চিমবাংলা সরকারের সাফল্যের ওপরে লেখা ঢাকার দৈনিক সংবাদে সৈয়দ আলী কবীরের 'কমিউনিস্ট হোয়াট কমিউনিস্ট?'[১০] তবে সাধারণ লোকের কিছু অংশের পশ্চিমবাংলা রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহল ও শ্রদ্ধার কতকটা বোধহয় তারা ভাবেন তাদের মতো পশ্চিমবাংলা সরকারও 'ভারত-বিরোধী'। আমাদের যেমন রাজনীতিতে যেকোনো ব্যর্থতা ভারত সরকারের ওপর চাপানোর প্রবণতা আছে, ঠিক তেমনই বাংলাদেশেরও নিজেদের ব্যর্থতার সবকিছুই ভারত সরকারের হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে শেষ হলেই চিন্তা ছিল না—কিন্তু অনেক সময় দোষটা আবার 'নন্দ ঘোষ' হিন্দুর ঘাড়ে এসে পড়ে। এটা একটা স্কেপগোট।

এখানে বলা দরকার যে রাষ্ট্রপতি লেঃ জেঃ হোসেন মহম্মদ এরসাদের আমলে, বিশেষ করে তার জাতীয় পার্টি দল প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে উগ্রভারত ও হিন্দু বিরোধিতা কিছুটা কমেছিল। এটাকে কাউন্টারব্যালেন্স করার জন্য শ্রীএরসাদও ইস্‌লাম-পছন্দ অনেক লোককে তাঁর সঙ্গে রেখেছিলেন ও পাকিস্তানি নাগরিক, ১৯৭১-এ বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী আল-বদরের সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক গোলাম আজম ও মুজিব হত্যাকারী লেঃ জেঃ ফারুককে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিচ্ছিলেন। অন্যদিকে বলা দরকার বাংলাদেশি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি এরসাদের প্রভাব সীমিত ছিল। আশাকরি এরসাদের পর যেন আবার তীব্র ভারত-বিরোধিতা, ভারতীয়-বিরোধিতা ও বাংলাদেশি হিন্দু বিরোধিতা ও সংখ্যালঘু বিরোধিতা শুরু না হয়। পশ্চিমবাংলা সরকার ও জনগণের মধ্যে যেভাবে আদানপ্রদান বাড়ছে তাতে দুদেশের বোঝাপড়াতে সুবিধা হবে।

উল্লেখপঞ্জি

১. বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স; বাংলাদেশ সরকার। স্ট্যাটিসটিক্স ইয়ারবুক অব বাংলাদেশ, ১৯৮৩-৮৪। পৃ. ৬২৩।

২. শ্রীবদরুদ্দিন উমরের লেখার সংখ্যা প্রচুর। তার মধ্যে কয়েকটাই উল্লেখ করছি : পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খণ্ড (১৯৭০), ইডেন প্রেস, ঢাকা ; দ্বিতীয় খণ্ড (বাং ১৩৮২) মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ; পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট (১৯৭১), নবজাতক প্রকাশনী, কলিকাতা ; বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক (১৯৮৫), মুক্তধারা, ঢাকা।

৩. গোলাম সাকলায়েন, 'অন্তরঙ্গ আলোকে ডক্টর শহীদুল্লাহ', আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭০।

৪. রসিদ আমজাদ, 'ইনডাসট্রিয়াল কনসেনট্রেশন এণ্ড ইকনমিক পাওয়ার' ; হাসান গারদেজি ও জামিল রশিদ-এর 'পাকিস্তান : দি রুটস্ অব ডিক্টেটর-শিপ', অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, দিল্লি, পৃ. ২৫৫।

৫. রেহমান শোভান, 'দি ক্রাইসিস অব এক্সটারনাল ডিপেন্ডেন্স', দি ইউনি-ভারসিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৮২।

৬. ডমিনিক লাপিয়ের, 'দি সিটি অব জয়', ওয়ারনার বুক্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৫।

৭. তালুকদার মণিরুজ্জামান, 'গ্রুপ ইন্টারেস্ট এণ্ড পলিটিক্যাল চেন্জেস্ : স্টাডিস অব পাকিস্তান এণ্ড বাংলাদেশ', সাউথ এশিয়ান পাবলিশার্স, নতুন দিল্লি ; ১৯৮২ ; পৃ. ১২৩।

৮. ঐ, পৃ. ১২২।

৯. খন্দকার আলমগীর, 'বাংলাদেশি বনাম বাঙালি' উত্তর আমেরিকা প্রথম বঙ্গ সম্মেলন, ১৯৮১ ও পরে নিউ ইয়র্কের 'সংবাদ বিচিত্রা'য় প্রকাশিত, সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৮৩, পৃ. ১২-১৩।

১০. সৈয়দ আলী কবীর, 'কমিউনিস্ট হোয়াট কমিউনিস্ট'; প্রবাসী, নিউ ইয়র্ক, মে ২৩, ১৯৮৬, পৃ. ২ (ঢাকার পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত)।

বাংলাদেশে হিন্দু

বাংলাদেশে ভবঘুরের মতো ঘুরেছি বলে প্রায় সব ভারতীয়ই, বাঙাল হলে তো কথাই নেই, আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করেছেন বাংলাদেশ ও ওখানকার হিন্দুদের কথা। এছাড়া আমার চেনা-পরিচিত অনেকেই ওদিকে ছিলেন। এদের সবাইর জন্যই এটা লিখছি।

বাংলাদেশে যখন জিজ্ঞাসা করেছি 'হিন্দুরা কেমন আছে?' গ্রাম ও শহরে, ধনী ও গরিবের, এবং হিন্দু-মুসলমানের খোলাখুলি উত্তর 'এই কোনমতে আছি', 'প্রিকেরিয়াস', 'ব্যাক এগেইন্স্ট দা ওয়াল' বা 'ধ্বংসের পথে' থেকে 'হিন্দু হয়ে বাঁচা যাবে না' ও 'এখন আগের থেকে অনেকটা ভালো'। স্বাভাবিকভাবেই এগুলো খুব দুঃখের সঙ্গে লিখছি। তবে এই সুর বা থীম (Theme) সবার কাছেই শুনেছি। তাই বাংলাদেশি হিন্দুদের কথা লিখতে গেলে রাশিয়ার জারের আমলে ইহুদী বিরোধী 'পোগ্রোমে'র কথা মনে পড়ে। রাশিয়ায় ইহুদীদের তাড়ানো ও সম্পত্তি নেওয়ার জন্য কিছুদিন অন্তর সরকার উৎসাহিত 'পোগ্রোম' বা রায়ট করানো হতো। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর যেখানে হিন্দু-বিরোধী রায়ট হয়নি। তবে এখন মধ্যবিত্তের একাংশের হিন্দু-বিরোধিতা সারফেসের (surface) নিচে গেছে। খোলাখুলি ভাবে আর নেই।

কিছুদিন আগে আমার এক নিউজার্সির বন্ধু সাদেক ফোন করে নিমন্ত্রণ জানাল 'দেশ থেকে আমার ফুফু ও খালু এসেছেন ইউনাইটেড নেশনের কাজে এবং আমার ফুফু আমাদের সমাজ নিয়ে অনেক লেখাপড়া করেন সে তো আপনি জানেন। আরও কয়েকজন মেহমানকেও দাওয়াত দিচ্ছি। আপনারা আসবেন?' বলেছিলাম 'অবশ্যই, দাওয়াত না পেলেও আসতাম'। সাদেকের ফুফুকে আমরা সেলিমা পিসি বা পিসিমা বলেই ডাকি, এবং বেশ কয়েকবার দেখেছি এবং ওনার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দেওয়া যায়। ভদ্রমহিলা পাকিস্তান সরকার ও পরে বাংলাদেশ সরকারে শিক্ষা, প্রচার, রেডিও বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে

কাজ করেছেন, এবং সরকারি ডেলিগেট হিসেবে বিদেশে গেছেন ৩০/৩৫ বার, এবং অন্তত ৭০/৮০টা দেশে এবং ভারতের প্রত্যেকটা রাজ্যে ঘুরেছেন। সেলিমা পিসিকে অনেক কথার পর হিন্দুদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করাতে, অনেক দুঃখের সঙ্গে বললেন 'দেশে হিন্দুদের অবস্থা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানির ইহুদীদের মতো'। প্রশ্ন করেছিলাম 'মানে?' বললেন 'গ্রামে-গঞ্জে একদল লোক প্রায় প্রফেশনার পলিটিসিয়ান, তাদের যে কোনো ফেইলিওর-এর (failure) কারণ হিন্দুদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করেন। যেমন তাদের আছে দেশের ফেইলিওরে হিন্দু ভারতকে লাগানো। 'মিড্নাইট চিলড্রেন' খ্যাত লেখক সলমন রুশদীর কথা মনে পড়ছিল। 'সেম' এ রুশদী লিখছেন যে হিন্দু-ইহুদী বিহীন পাকিস্তানে সেখানের শাসককুল এখনও তাদের সব কিছুর ব্যর্থতার কারণ হিন্দু ও ইহুদীদের দিয়ে থাকেন[১]। আর বাংলাদেশে তো এখনও অনেক সংখ্যালঘু আছেন। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করেনি। ১৯৮২তে বরিশাল থেকে ফরিদপুর যাওয়ার পথে এক বাঙালি খ্রিস্টধর্ম প্রচারকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, নাম রেভারেণ্ড স্টিভেন্স। আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের আরেক বন্ধু নলচিটি ইফ্তিকার তালুকদার এবং বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। রেভারেণ্ড যাচ্ছিলেন মাদারীপুরে একটা পাদ্রীদের সম্মেলনে। অনেকটা পথ উনিই আমাদের গাইড ছিলেন। বাস গেল দোয়ারিকা, শিকারপুর, বামরাইল, বাটাযোর; মাহিলারা হয়ে। দোয়ারিকা নদীর ওপর ফেরী ও সন্ধ্যা নদীর ওপর শিকারপুরের ফেরীতেই অনেকক্ষণ লেগে যায়। তাই বেশ কয়েক ঘণ্টা ওনার সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। অনেক কথার মধ্যে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'খ্রিস্টানরা কেমন আছে?' উত্তরে বললেন 'হিন্দুদের থেকে অনেক ভালো'। আরও বললেন 'আপনাদের দরকার এদের ধরে রাখার চেষ্টা করা, আর আমরা তো আর হিন্দুদের ধরে রাখতে পারব না!' বাংলাদেশে এখনও হিন্দু আছেন এক কোটির ওপর ও এর অধিকাংশই গরিব বৈশ্য ও নমঃশূদ্র। বামুন-কায়েতও আছে অনেক। ১৯৮১-এর বাংলাদেশ সেনসাস অনুযায়ী ১২·১% হিন্দু ও ১·২% অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু আছে। গত ৪০ বছরে এই হার দারুণভাবে কমেছে।

বাংলাদেশের সেনসাস বা আদমসুমারী থেকে সেখানকার জনসংখ্যার হিসাব তুলে দিলামঃ।

বাংলাদেশ জনসংখ্যা

বছর	লোকসংখ্যা	সংখ্যালঘুর হার
১৯৪১	?	২৯·৭%
১৯৫১	৪৪,১৬৫,৭৫০	২৩·১%
১৯৬১	৫৫,২২২,৬৬৩	১৯·৬%
১৯৭৪	৭৬,৩৮৯,০০০	১৪·৬%
১৯৮১	৮৯,৯২১,০০০	১৩·৩%

সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ১৯৮৩-৮৪ ; (পৃ ৭৯-৮০)

অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুই প্রধানত, দেশ ছেড়েছেন ১৬·৪% এবং বাংলাদেশি সেনসাস এর দেশের জন্মমৃত্যু হিসাব করলে এই সংখ্যা যাঁরা ভারতে এসেছেন তা দেড় কোটি থেকে দু কোটি হবে। ইদানীং পশ্চিমবাংলা সরকারই বলছেন যে সেখানে এককোটি বাংলাদেশি উদ্বাস্তুর বাস। এছাড়া নিশ্চয়ই আরও পূর্ববঙ্গীয় আছেন যাঁরা নিজেদের উদ্বাস্তু মনে করেন না। এত বড়ো মাইগ্রেশন বোধহয় গত কয়েক শতাব্দীর ইউরোপ ও আফ্রিকা থেকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় লোক যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা যায়। তবে এই বাংলাদেশি পূর্ববঙ্গীয় মাইগ্রেশন অনেক অল্প সময়েই হয়েছে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১র মতো 'সম্পূর্ণ স্বাভাবিক' অবস্থাতেও বাংলাদেশ থেকে ভারতে হিন্দু এসেছে অন্তত এক লক্ষ[২] এবং ত্রিপুরায় বাংলাদেশি বৌদ্ধ যা এসেছে তার থেকে অনেক বেশি।

১৯৪৭ থেকেই বাংলাদেশে ভাষাগত ও ধর্মগত দুয়েরই পরিবর্তন হয়েছে। ভাষাগত দিক থেকে দেখতে গেলে বাংলাদেশ বোধহয় এক ভাষাভাষীদেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে অবাঙালি আছেন এখন শতকরা এক ভাগেরও কম। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সম্প্রদায়, উত্তর বাংলার অল্প সংখ্যক সাঁওতাল-লোধা, ময়মনসিং সিলেটের গারো ও হাজং ভাষী ও ঢাকার কুট্টি সম্প্রদায়। কুট্টিরা এখন বাঙালিদের সঙ্গেই মিশে গেছেন। এছাড়া উর্দুভাষী বিহারীরা এখন সবাই পাকিস্তানের পথে, উপায় না থাকলে ভারতমুখী। ১৯৪৭-এ যে হারে সংখ্যালঘু ছিল সে হারে ১৯৮১তে সংখ্যালঘু থাকলে তাদের সংখ্যা হতো ২ কোটি ৭০ লক্ষের মতো। ১৯৮১তে সংখ্যালঘু ছিল এক কোটি ১৬ লক্ষ ৩৩ হাজার—প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ কম। এটা খুব গড় পড়তা হিসাব বা ক্রুড লস (crude loss)। ঠিকমতো হিসাব করলে আরও বেশি হবে। পার্টিসনের আগে বাংলাদেশের শহরগুলোর

বেশির ভাগই ছিল হিন্দু প্রধান — সেরকম এখন আর কোনো শহর নেই। জেলা হিসাবে খুলনায় ৫২%, দিনাজপুর-ফরিদপুর-যশোরে ছিল ৪০% এর বেশি, পার্বত্য চট্টগ্রামে ৮০% এর বেশি, এছাড়া সিলেট, বরিশাল ও আরও কয়েকটি জায়গায় ২৫% এর বেশি সংখ্যালঘু ছিলো। এখন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা বেশি আছেন সীমান্তের কয়েকটি জেলাতে—খুলনা (২৭%), দিনাজপুর (২১.৯%), যশোর (১৯.৬%), পার্বত্য চট্টগ্রাম (৫৫%) ও ফরিদপুরে (১৮.৮%)[৩] এক ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে আছেন ৪০% এর বেশি হিন্দু—প্রায় সবাই গরিব বৈশ্য-নমঃশূদ্র। এনারাই এখন হিন্দুদের মঠ-মন্দির, প্রতিষ্ঠান অনেকাংশে রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই প্রথম বোধহয় হিন্দুদেরও বামুন-কায়েত বাদে অন্য কেউ নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এঁনাদের উৎসাহেই বাজিতপুরের প্রণব মঠের (পুরোনো নাম ভারত সেবাশ্রম সংঘ) মতো জায়গায় পুজো ও শিবরাত্রিতে এক লক্ষেরও বেশি লোক আসেন।[৪]

বাজিতপুরের কথাতেই মনে পড়ে গেল যে গরিব হলেও রক্ষে নেই। ওখানের অনেকে দুঃখ করে বললেন 'এই তো দেখুন আমাদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য কিছুদিন আগে ৮০/৮২ বছরের স্বামীজীকে কারা যেন খুন করল। ওই গুণ্ডাদের ইচ্ছে ছিল মঠের ও প্রতিবেশীদের অল্পসল্প জমি জায়গা যা আছে তা দখল করার'। সুখদুঃখের অনেক কথা হয়েছিল অল্পবয়সী ব্রহ্মচারী তমাল ও ব্রহ্মচারী প্রদীপের সঙ্গে। স্বামী কালীকানন্দজীর সঙ্গে দেখা হয়নি সে যাত্রায়। দেখা না হলেও পত্রালাপ ভালোই আছে। পুরানো মন্দির ও শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দের প্রার্থনা 'গুহা' ভেঙে যাচ্ছে বলে সাহায্য চেয়েছিলেন। দিয়েছিলামও তাদের কথামতো। দরকারের কথা অন্যদের বলব বলেছিলাম। এই সামান্য সহানুভূতি দেখিয়েছিলাম বলে পরে জানিয়েছিলেন যে তাঁরা আমার নামে একটা 'ফলক' লাগাবে প্রণব মঠে। ঘোরতর আপত্তি করে চিঠি দিয়েছিলাম। পুজো-আচ্চা কোনোদিন করিনি কোথাও তাই আমার নামে ফলক লাগানোতে আরও বেশি অশোভন ও অন্যায় হবে লিখেছিলাম।

বাংলাদেশে মুসলমান ও অমুসলমানদের থেকে আমার যা ধারণা হয়েছে তা হলো হিন্দু আসার এই জনস্রোত শেষ হয়নি বরং পূর্ণোদ্যমে চলছে এবং চলবে। কিন্তু এতে কোনো লোকের বা দলের হাত আছে?—তা আমার মনে হয় না। অনেকের কাছে এটাই স্বাভাবিক। সরকারি-বেসরকারি মিলিটারি বা সাধারণ, হিন্দু বা মুসলমান, ধনী-গরিব সবার কাছেই একটা কথা শুনেছি সেটা হলো 'ওরা

আর এদের থাকতে দেবে না'। এই 'ওরা'টা খোঁজ করার চেষ্টা করেছি—কিন্তু পাইনি। এই সঙ্গে একথা বলা দরকার যে খুব দু-একজন বাদ দিলে বাংলাদেশি সবাই চান যে তাঁদের হিন্দুরা আর সবার মতো মাথা তুলে সুখে শান্তিতে বাঁচুন।

প্রথম প্রথম যখন অন্য বন্ধুদের সঙ্গে 'গাইডেড ট্যুরে' যাই তখন হিন্দুদের শোক বা জ্বালা, ভেতরে ভেতরে এত টেনশন্ সেটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু যখন নিজে নিজেই ঘুরতে চেয়েছি তখন বুঝতে সুবিধা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সবাই অনেক কারণ দেখিয়েছেন তার কয়েকটা লিখলাম।

বাংলাদেশে এখনও একটা আইন আছে যেটার বলে হিন্দুদের সম্পত্তি প্রায় বিনা বাধায় ও বিনা ক্ষতিপূরণে সরকার নিয়ে নিতে পারেন এবং সাধারণ লোকও এর মাধ্যমে হিন্দুদের সম্পত্তি পেতে পারেন। এটার বিভিন্ন নাম ছিল, যেমন: 'শত্রু সম্পত্তি আইন', 'এবানডনড্ প্রপার্টি আইন' এবং এখন এর নাম 'ভেস্‌টেড্ প্রপার্টি আইন'। সত্যি কথা কি বাংলাদেশের অনেকেই এই আইনের তাৎপর্য ও টেরর (Terror) সম্পর্কে অবহিত নন, আর আমরা বাঙাল-ঘটি পশ্চিমবঙ্গীয়রা তো নয়ই। এই আইনের বলে আয়ুবশাহী আমল থেকেই লক্ষ লক্ষ হিন্দুর সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। বরিশাল শহরের শংকর মঠের লোকেরা ঘুরিয়ে দেখালেন (তাঁদের যে জমিগুলো সরকার নিয়ে নিয়েছিলেন) এই একটি মাত্র জায়গায় সংখ্যালঘুরা অনেক কোর্ট-কাছারির পর তাদের জমি ফিরে পেয়েছেন, এবং মঠের উদ্যোক্তারা, গুপ্তবাবু ও ডাঃ রায়, সেখানের জমিতে ছাত্রাবাস তৈরির চেষ্টায় আছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় সাহায্যের খোঁজ করছেন। বরিশালের চারণকবি মুকুন্দ দাস প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ির জমি এখন 'শত্রু সম্পত্তি', তেমনই ঢাকায় হিন্দু বিধবা ট্রাস্ট এর জমি। হিন্দু অনাথ আশ্রমের সম্পত্তিও হাতছাড়া। এ তো গেল দু-একটা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা। এই আইনের ব্যাপারে আমার মুসলমান বন্ধুরা যাঁরা কিছু খোঁজখবর রাখেন তাঁরাও অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। চট্টগ্রামের ব্যারিস্টার শ্রীমৃদুলকান্তি রক্ষিত এই বিষয়ে সমস্ত তথ্য সহ একটা বই লিখেছেন, 'দি ল অব ভেস্‌টেড প্রপারটিস্ ইন বাংলাদেশ'।[৫] রাষ্ট্রপতি এরশাদ এই আইন তুলে নেবেন শুনেছিলাম। ওনার ইচ্ছা থাকলেও দেশের রাজনীতির চাপে এই আইন তুলে না নিলেও এই আইন আর প্রয়োগ করা হবে না বলে জানান। এই নিয়ে অনেকদিন ধরে হিন্দুরা আপত্তি জানাচ্ছিলেন এবং আন্দোলন-মিটিং করছিলেন। সঙ্গে ছিলেন কিছু মুসলমান বুদ্ধিজীবীও। এর ফলে ৬. ৮. ৮৪ তারিখে জানানো হয়:

'বিষয় : মহামান্য রাষ্ট্রপতির [এরশাদ] ঘোষণাকারী'।

'গত ৩১ জুলাই, ১৯৮৪ ঢাকার শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মহা-সম্মেলনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি [এরশাদ] নিম্ন-লিখিত প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন।

১। অর্পিত সম্পত্তি হস্তান্তর এবং নূতন কোনো সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা করা বন্ধ করা হলো।

২। আইনগত দিক থেকে কোনো বাধা না থাকলে অর্পিত সম্পত্তি সাধারণ হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

৩। দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি সরকারের বিনা অনুমতিতে হস্তান্তর করা যাবে না।

৪। শ্মশানঘাট ও অনুরূপ স্থান সরকারের বিনা অনুমতিতে হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হলো।

এই ঘোষণায় রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে স্বাক্ষর করেন সচিব শ্রীএ. এস. নুরমহম্মদ।[৬]

বাংলাদেশি সংখ্যালঘু ও অনেক মুসলমান বুদ্ধিজীবী চেয়েছিলেন এই আইন একেবারে তুলে নেওয়া হোক, এবং এর ফলে যে সব হিন্দু সম্পত্তি, দেবোত্তর সম্পত্তি, শ্মশানঘাট-আদি সরকার বা অন্যলোক নিয়ে নিয়েছেন সেগুলো ফেরত দেওয়া হোক। কিন্তু তা হয়নি। এ ব্যাপারে মনে রাখা দরকার যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যাঁর প্রতি আমাদের খুব ভালো ধারণা তাঁর আমলেও এই আইন তোলা হয়নি, সে দিক দিয়ে রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদের আদেশ একটা বিরাট পদক্ষেপ ছিল। দরকার ছিল আরও কিছু এগোবার।

এরপর ২৪. ১১. ১৯৮৪তে বাংলাদেশ সরকারের ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসকদের 'অর্পিত সম্পত্তি' বিষয়ে জানান :

'নিম্ন স্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে অর্পিত সম্পত্তি নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম এবং নূতন করিয়া কোনো সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করা ২১. ০৬. ৮৪ তারিখ হইতে স্থগিত করা হইয়াছে। উক্ত ২১.০৬.৮৪ তারিখের পরে সম্পত্তি সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঘোষণাবলীর পরিপন্থী কোনো আদেশ জারি করা হইলে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইবে।'

এ প্রসঙ্গে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সচিব মহোদয়ের ০৬. ০৮. ৮৪ তারিখের স্মারক নং সি. এম. টি ৭২ (২) ৮৪-৮১ [৭] এর সংশ্লিষ্ট অংশের উদ্ধৃতি তাঁহার

স্বার্থে ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য অত্র-সঙ্গে সংযোজিত করা হইল।[৭]

এই আইনে সব হিন্দুই কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এমনকি যার শুধু মাথা গোঁজার একটু জায়গা ছিল সেও এই আইনের ফলে হিন্দুদের সম্পত্তি নেওয়াই হয়েছে তাই নয়, তাদের 'এনিমি' বা দেশের শত্রুও বলা হয়েছিল—সেটা আরও আপত্তিকর। ইদানীংকাল ছাড়া পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তর দশকে হিন্দুরা এই অবিচারের ওপর আন্দোলন না করে কলকাতায় চলে এসেছেন। ময়মনসিং-এর সাংবাদিক একটু দুঃখ করেই বলেছিলেন 'আপনারা যদি নিজের দেশ ছেড়ে কলকাতা আগরতলাতে কংগ্রেস-কমুনিস্ট পলিটিক্স না করতেন আর কলকাতায় গিয়ে 'বাংলাদেশের হিন্দুদের জন্য জমি চাই না বলে এখানেই সেই পলিটিক্স করতেন তা হলে আমাদেরও ভালো হতো। আপনারা সবাই আমাদের ডিনাই (Deny) করেছেন।' এই কথা অনেকের কাছেই শুনেছি।

বাংলাদেশি সংখ্যালঘুরা আরেকটি ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সেটা হলো তাদের সরকারি, আধাসরকারি কাজে নিয়োগ করার ঔদাসীন্য। ভারতে তো আমরা সবাই সবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি। আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেনের মতো ধনী দেশেও এই অভিযোগের কোনো কমতি নেই। তবুও একথা ঠিক উঁচু বা মাঝের সারির কাজে, কিংবা মন্ত্রীত্বে বা পুলিশ-মিলিটারিতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু—ভাষা বা ধর্মীয় নেই বললেই চলে। ভারতের মতো বহুদলীয় শাসন কাঠামোয় এবং যেখানে 'ফ্রিডম অব প্রেস' আছে সেখানে এই অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ রাজনীতির একটা অংশ।

স্বাধীনতার পরে মুজিবের সময় ১৯৭৩-এর নির্বাচনে সংখ্যালঘু হিন্দু খ্রিস্টান 'বৌদ্ধ, উপজাতীয় প্রার্থী হয় ৪৭ জন এবং নির্বাচিত হন তিনশজন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১২ জন (৪%)। দশজন ছিলেন আওয়ামীলিগ দলের ও দুজন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সম্প্রদায়ের নির্দল প্রার্থী। এ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক জিলুর রহমান খান তাঁর লেখায় 'মাইনরিটিস ইন বাংলাদেশ' (১৯৭৬)-এ।[৮] এই নির্বাচনে ও আগেও বাংলাদেশে ন্যাপ ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি হিন্দু অন্যান্য সংখ্যালঘুদের প্রার্থী দেয়। ১৯৭৩-এর নির্বাচনে আওয়ামীলিগ ৩০০ জনের মধ্যে ১৩ জন সংখ্যালঘু প্রার্থী দেয়, সে জায়গায় ছোট দল ন্যাপ (এম্) প্রার্থী দেয় ১৮ জন সংখ্যালঘুকে।[৯] ১৯৪৭-এর দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ ও ভারত-পাক স্বাধীনতার

আগে থেকেই বাংলায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর বামপন্থীদের প্রভাব ছিল। মহম্মদ্ গোলাম কবীর তাঁর 'মাইনরিটি পলিটিক্স ইন বাংলাদেশ'-এ লিখেছেন "যদিও তিনজন মুসলমান···কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন, এর নেতৃত্ব সাধারণ-ভাবে বাঙালি ভদ্রলোকদের হাতে ছিল। ···পূর্ব পাকিস্তানের কোনো কোনো জায়গায় পার্টি চাষীদের রিভোল্ট ফরমেণ্ট (**Revolt forment**) করার চেষ্টা করে, এর ফলে পার্টির অনেককে গ্রেফতার ও আরও অনেকে আত্মগোপন করেন। ১৯৫০-এর রায়ট-এর পরে পার্টির ১০,০০০ সদস্যের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ ভারতে চলে যায়। অনেক নেতৃস্থানীয় লোকের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারী থাকে। ···১৯৬৬-তে যখন পূর্বপাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম. এল) পিকিংপন্থী ও মস্‌কো-পন্থীতে ভাগ হয় তখন মণি সিং পার্টির নেতা ছিল। এরপর মণি সিং এবং বেশির ভাগ নেতৃস্থানীয় হিন্দু কমিউনিস্ট মস্‌কোপন্থীদের সঙ্গে যান। পিকিংপন্থীদের নেতৃত্ব দেন অন্য একজন হিন্দু কমিউনিস্ট সুখেন্দু দস্তিদার এবং এর অধিকাংশ নেতা ও কর্মী ছিলেন মুসলমান। এরপর কমিউনিস্ট পার্টি (এম. এল.) গ্রুপ আরও আধ ডজনের বেশি ভাগে ভাগ হয়। একমাত্র সিরাজ সিকদারের গোষ্ঠী ছাড়া আর সব গোষ্ঠীর নেতাই ছিলেন হিন্দুরা। কমিউনিস্ট পার্টির মতো ন্যাপও মস্‌কো ও পিকিংপন্থীতে ভাগ হয়। মস্‌কোপন্থী ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি)তেও তুলনামূলকভাবে বেশি হিন্দু নেতৃত্বে ছিলেন পিকিংপন্থী ন্যাপের চেয়ে যার নেতৃত্বে ছিলেন মৌলানা ভাসানী"।[১০] এই সব কারণেও বামপন্থীদল ও নেতৃত্ব হিন্দু পলিটিশিয়ান, সাধারণ হিন্দু গরিব মধ্যবিত্ত-বৈশ্য নমঃশূদ্র সবাই দক্ষিণপন্থী ইস্‌লামপন্থী, মুসলিমলিগপন্থী, ভারত-বিদ্বেষী, এমনকি ননপলিটিক্যাল সাধারণ মুসলমানের চক্ষুশূল হয়েছেন। হিন্দুদের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত কংগ্রেসিরা তো আরও আগে তড়িঘাড় চলে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ে। বরিশালের এক গণ্ডগ্রাম, মাহিলাড়ার পাশে, কুপাতনগরে একটা বাড়ির খোঁজে গিয়াছিলাম। অনেকের মধ্যে তিনজন দিনমজুরের (চাষের সময় ভূমিহীন কৃষক) সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এবং অল্প সময়ের আলাপে যে কিরকম কাছে টেনেছিলেন তা লিখে বোঝানো যাবে না। নাম শ্রীসুভাষ কুলু, শ্রীমণীন্দ্র ঘরামী ও শ্রীনগেন কুলু। এনারা বাংলাদেশি পরিসংখ্যান অনুযায়ীও অতি-গরিব (তবুও পান ও ডাবের জল অফার করতে ভোলেননি)। যে দিন কাজ থাকে দিনে আয় ভারতীয় টাকায় আড়াই থেকে তিন টাকার মতো। একটা কথা বারবার বলেছেন যে 'আপনারা হিন্দু ভদ্রলোকেরা চলে গিয়ে

আমাদের সমস্যা ও কষ্ট অনেকগুণ বেড়ে গেছে'। বাবু ও পলিটিশিয়ানরা তাদের ফেলে আসার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির কথাই বলেছেন।

১৯৮৬র বিতর্কিত এবং কিছু দলের বর্জিত নির্বাচনে সংখ্যালঘু নির্বাচিত হয়েছেন তিনশজন সংসদ সদস্যের মধ্যে ছয়জন। তিনজন এরসাদের জাতীয় পার্টির (এর মধ্যে দুজন বৌদ্ধ এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের)। আর আওয়ামীলিগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (স) দলের একজন করে। এর মধ্যে বরিশালের শ্রীসুনীল-কুমার গুপ্ত ও পার্বত্য চট্টগ্রামের শ্রীবিনয়কুমার দেওয়ান মন্ত্রী পরিষদে ছিলেন।

দেশের ও হিন্দুদের এই দুর্দশার কারণ অনেকে বলেন আয়ুবশাহীর মিলি-টারি ডিক্টেটরশিপ ও তার সঙ্গে বহুদলীয় গণতন্ত্রের অবসান। আমার ধারণা আয়ুবশাহী কয়েকটি কারণের মধ্যে অন্যতম; এছাড়া আছে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। সাধারণভাবে আমরা 'ভদ্রলোকেরা' এ নিয়ে চিন্তা করতে চাই না, এবং অনেকক্ষেত্রে কল্পনা, অবাস্তবতা ও ফ্যানটাসির মধ্যে বাস করি।

বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিভিন্নদল 'ভোট পাবার' জন্য হলেও বিভিন্ন রকমের লোকেদের তাদের দল থেকে প্রার্থী করায়। অথবা বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, এলাকার লোকেরা তাদের নিজেদের দল করে প্রার্থী করে—মানে রিজিওনাল পার্টি। এক পার্টির দেশে বা ডিক্টেটরশিপে একেবারে কট্টর বর্ণবাদী বা ধর্মবাদী না হলে পার্টির মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রুপের লোকেদের সিলেক্ট বা নমিনেট করে। এতে আশা করা যায় সমাজ বা দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব একটু কম হবে। পাকিস্তানি স্বাধীনতায় মুসলিম জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ছিল হিন্দু বিরোধিতা। সেই জন্য সেখানে হিন্দুদের কো-অপ্‌ট (co-opt) বা মিশিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ছিল। হিন্দুরা অখণ্ড ভারত ও সামাজিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে কো-অপ্‌ট হওয়ারও চেষ্টা করেননি। বাংলাদেশ ও তার হিন্দু সমাজ এর খেসারত দিচ্ছে।

অল্প বয়সী হিন্দু ও খ্রিস্টানদের সঙ্গে কথা বললে তাঁরা প্রায়ই একটা অভিযোগ করেন যে তাঁরা পড়াশুনায় ভালো করলেও, পরীক্ষায় ভালো করলেও, কাজে নিয়োগের বেলায় পিছিয়ে পড়ছে—এ কথা আগেই বলেছি। শুধু কাজেই নয় মেডিকেল-ইন্‌জিনিয়ারিং-এর মতো বিশেষ কলেজে যেখানে পরীক্ষার পর মৌখিক ভাইভা হয় সেখানে তারা আর এগোতে পারছে না। অর্থাৎ যেখানে লেখা পরীক্ষায় তাদের আইডেনটিটি অজানা, সেখানে তারা ভালো করছে এবং যেখানে তাদের সংখ্যালঘু সত্তার পরিচয় পাচ্ছে সেখানে তাদের পিছিয়ে যেতে হচ্ছে।

মানে ডাইভায় তাদেরকে ইচ্ছে করে ফেল করাচ্ছে। এতবড়ো অভিযোগের সত্যি-মিথ্যা যাচাই করার তথ্য আমার নেই। তবে যে কারণেই হোক এ ধরনের একটা ধারণা দানা বেঁধেছে।

১৯৮৪তে প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা স্কুল-কলেজে সামান্য বেশি হারে যায়। নীচে তার একটা সংক্ষিপ্ত টেবল দিলাম।

বাংলাদেশে স্কুল-কলেজে পড়ার তালিকা—১৯৮১

বিভিন্ন গ্রুপের ক'জন স্কুল-কলেজে যায় (শতকরা হার)

	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান
বাংলাদেশ	২৩.৫৯%	২৭.৬৫%	২৩.৬৯%	৩৮.৯৮%

কলেজের বয়সের ছাত্র-ছাত্রী (ম্যাট্রিকের পর) :

বয়স (১৫-১৯)	১৬.২৬%	২১.৩৯%	২০.১৮%	৩৩.০১%
বয়স (২০-২৪)	৬.৯৪%	৭.৩৩%	৭.৭৬%	১৩.১২%

সূত্র : বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস ১৯৮১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ; আগস্ট ১৯৮৪, পৃ. ২১৯

অনেকে অনেক উদাহরণ দিয়েছেন—বিশ্বাস করতে চাইনি বলেই তার দু'-একটা লিখলাম। গতবছর ঢাকায় আমাদের এক পরিচিতা কৃষ্ণার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কৃষ্ণার স্বামী সাংবাদিক। কৃষ্ণা উচ্চশিক্ষিতা এবং এম. এ., বি. এড। গিয়েছিলেন একটা সাধারণ স্কুলের মাস্টারির চাকরিতে ইণ্টারভিউ দিতে। চারটি প্রশ্ন করেছিলেন ইণ্টারভিউ বোর্ড। কৃষ্ণা—'ভারতের কতবড় সমর্থক'? 'ইন্দিরাগান্ধীকে কতটা ভালোবাসেন'? 'আপনারা শাঁখা সিঁদুর 'পরেন কেন?' এবং 'শাঁখা সিঁদুর পরেই পড়াতে আসবেন কিনা?' কৃষ্ণা চাকরি না পাবার দুঃখের থেকেও হিউমিলিয়েটেড ফিল করেন। পরে ইণ্টারভিউ চেয়ারম্যান স্থানীয় এড-ভোকেটের বাড়িতে গিয়ে চেঁচামেচি করাতে চেয়ারম্যান বলেছিলেন 'আমার অফিসে ক্লায়েণ্টের সামনে এসব কথা বলবেন না। ভেতরে আসুন, কথা হবে।' নির্বাচিত প্রার্থীর বদলে কৃষ্ণাকে চাকরি দেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন বলেছিলেন। কৃষ্ণা অবশ্য সে বিবেচনা করতে বারণ করেছিলেন। আমার এক ঘনিষ্ঠ বাংলাদেশি বন্ধু, নওশের, এবং আমেরিকায় প্রফেসর সে ও তার হিন্দু সহপাঠী, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, এইরকম অভিজ্ঞতার কথা বার বার বলেছেন। ১৯৮১র যে মাসে

সাংবাদিক চঞ্চল সরকার 'বাংলা মাইনরিটিস ফিল ইন্‌সিকিওর' কলামে অমৃত-বাজার পত্রিকায় এর কয়েকটা দিক তুলে ধরেছিলেন।'[১১]

অন্যদিকে আমার কয়েকজন হিন্দুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, যাঁরা মনে করেন না হিন্দুদের অভিযোগের কোনো কারণ আছে। তাঁরা কোনোদিন ডিসক্রিমিনেটেড বা বৈষম্যের শিকার হননি। এঁরা সবাই নিজেদের বামপন্থী বলে পরিচয় দেন। কিন্তু আমার কাছে যেটা দুঃখের লেগেছে তা এদের প্রত্যেকেরই পরিবারের সবাই ভারতে বা আমেরিকায় চলে গেছেন গত চার-পাঁচ বছরে, এঁরাও মানসিকভাবে পা বাড়িয়ে। বাংলাদেশে আমাকে বেশ কয়েকজন বলেছেন 'আমাদের হিন্দুরা এখানে স্কুল-কলেজে পড়ে, অনেক সময় স্কলারশিপ পেয়ে বিদেশে গিয়ে যদি আমাদের দেশে না থেকে কাকা মামা-মাসির ডাকে কলকাতায় গিয়ে চাকরি নেয় বা বিয়ে করে সেটল (settle) করে তো আমাদের অনেক ক্ষতি।' ঠিকই। গরিব দেশের পক্ষে তো আরও মুশকিল।

আজ থেকে অনেকদিন আগে ১৯৫০ এর ২০ মার্চ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলিয়াকত আলিখানকে তদানান্তন পূর্ববাংলার এসেমব্লির সদস্য সর্বশ্রী বসন্তকুমার দাস, গণেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, মনীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, হারানচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী ও মনোরঞ্জন ধর পূর্ববাংলায় হিন্দুদের অভিযোগ সম্বলিত এক মেমো দেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচানোর জন্য 'হল ফেটেড মাইনরিটি কমিউনিটি হিয়ার ইজ ইনএক্সোরেবলি ফেস্‌ড উইথ এ গ্রীম প্রসপেক্ট অব ভারচুয়াল এক্সটিংশন'[১২] বলে। এর প্রায় তিরিশ বছর পরে রাষ্ট্রপতি জিয়া বরিশালে গেলে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হলে তারা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়া-উর-রহমানকে যে স্মারকলিপি দেন তা যেন আগের চিঠিরই কপি। ১৯৫০ সালে সংখ্যালঘুদের একটা বড়ো অভিযোগ ছিল তাদের বাচ্চাদের গুণ্ডারা কিড্‌ন্যাপ করছে। ১৯৮০ দশকের অভিযোগও এক ধরনের। হিন্দু ছেলেমেয়েকে কেউ কিডন্যাপ না করলেও তাদের প্রবলেমটা কমপ্লেক্স। কেউ 'প্রেমে' বা 'চাপে' পড়ে মুসলমান ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে করলেই হিন্দু সমাজের কাছে পরিত্যক্ত হচ্ছেন — কলকাতায় তাদের অতি উদার বা নাস্তিক আত্মীয় স্বজনের কাছেও। এদের কাউকেই 'কিড্‌ন্যাপের' দরকার হচ্ছে না। কলকাতায় তাদের নিকট আত্মীয়দের উপেক্ষা করে হয়তো থাকা যেত কিন্তু বাংলাদেশের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দেরও টান আছে। বসু, গঙ্গোপাধ্যায়, ঘোষ, গুহ, চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য, দাস, রায়চৌধুরী পদবীধারী হিন্দুর

সঙ্গে মুসলমানের বিয়ে হয়েছে এইরকম অনেককে জানি। একজন বাদে সবাই হিন্দুদের চোখে হেয় হয়েছেন। এক পরিবার তাদের ছেলেমেয়েদেরও 'হিন্দু করে' বড়ো করেছেন। কিন্তু হিন্দু সমাজের থেকে কোনো সম্বন্ধ এসেছে কিনা জানি না।

হিন্দুদের মঠ-মন্দিরগুলোও জরাজীর্ণ ও বিলুপ্তির পথে। এতেও সেখানের হিন্দুদের ক্ষোভ বেড়েছে। এক সময়ে কিছু হিন্দু কৃষ্টি, অনেকে বলেন তাদের ইন্‌স্‌টিটিউশন, সাম্প্রদায়িকতার কবলে পড়ে। সঙ্গে ধনী-মধ্যবিত্তদের দেশত্যাগের ফলে এগুলোর জীর্ণতা বেড়েছে। কিন্তু তারা যখন দেখেন এগুলো হারিয়ে যাচ্ছে এবং বড়ো বড়ো মস্‌জিদ তৈরি হচ্ছে দেশি বা আরব দেশের টাকায় তখন তাদের খারাপ লাগে। বরিশালের লক্ষণকাঠি গ্রামে গেছি, লোকে ঘুরিয়ে দেখাল দুটো মন্দিরের একটা এখন আর নেই। অন্যটা বেশ কয়েকশ বছরের পুরনো বিষ্ণুমন্দির। মন্দির বলতে আছে গ্রানাইটের বড়ো মূর্তিটি. এখন স্থানীয় গরিব ধোপা-পরিবার, হারানবাবু ওটার ওপর খড়ের চালা দিয়ে রেখেছেন। মাহিলাড়ার বহু পুরনো 'হেলানো' মঠ পড়ে যাবে হয়তো একদিন। বরিশালের শংকর মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন (এক পার্শি ভদ্রলোকের দানে তৈরি), মাদারীপুরের প্রণব মঠ (ভারত সেবাশ্রমের প্রথম আশ্রম স্বামী প্রণবানন্দজী প্রতিষ্ঠিত), ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির সবেরই এক অবস্থা। আর রমনার কালীবাড়ি সেটা বাংলাদেশ স্বাধীনতার সময় পাকিস্তানি সেনারা প্রায় সবটাই উড়িয়ে দেয়, বাদবাকিটা 'পরিষ্কার' করা হয় শেখ মুজিবের আমলে। কেন বঙ্গবন্ধু এটা করতে দিলেন সে নিয়ে অনেক মতামত শুনেছি। রমনার কালীবাড়ির এই অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে অধ্যাপক আবদুল গফুর 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়বাংলা' গ্রন্থে লিখেছেন :[১৩]

"ঢাকায় রমনায় রয়েছে রমনা কালীবাড়ি। প্রায় ৯০০ বছরের পুরনো। মোগল হানাদারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য এক সময়ে এই কালীমন্দিরেই ভূঁইয়াদের সঙ্গে ঈশা খাঁর মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ইংরেজ আমলে অগ্নিসন্তানরা শত্রুবধের রক্ত-শপথ গ্রহণ করত এই রমনার ঐতিহাসিক কালী-মন্দিরে। খান্ সেনারা এবার সেই মন্দিরটি ধ্বংস করেছে। ধ্বংস করেছে আরও অনেক কিছু ঢাকায়, সারা বাংলাদেশে।" এই মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করার জন্য হিন্দুরা একত্র হয়েছেন। এবং এরসাদ সরকার এই দাবির ব্যাপারে সহানুভূতিশীল ছিলেন।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা তাদের এইসব হেরিটেজ সম্পর্কে সচেতন এবং



ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন মন্দির



ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির

এগুলো বাঁচাতেও চান। পুরনো মন্দির মসজিদ টিভিতেও দেখানো হয়। অনেকগুলো আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করবেন বলে আশা প্রকাশও করেছেন। তবে মুশকিল দুরকমের। এক, গরিব দেশে এসবের পেছনে খরচা করার ক্ষমতা, ও দুই, অনেক ধর্মান্ধ ইস্‌লামপন্থীরা এই বাঁচানোর সদিচ্ছাকে হিন্দু ধর্ম বাঁচানোর সদিচ্ছা মনে করেন। তবে যেখানেই গেছি স্থানীয় লোকেরা, যার অধিকাংশই মুসলমান, আমাদের অনুরোধ জানিয়েছেন যে এগুলো, 'ঠিক করার' ব্যবস্থা করি। এগুলো আমি গ্রামের কথাই বলছি। এদের প্রস্তাব কলকাতায় দু-একটা বাঙাল বা পূর্ববঙ্গীয় সমিতির কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম, তাদের অন্যতম 'বরিশাল সেবা সমিতি'। কেউই সাহায্য করতে রাজি হয়নি হয়তোবা 'ভদ্রলোকের অভাব' অথবা 'মুসলমানী দেশ' বলে। বরিশাল সেবা সমিতিকে আরও প্রস্তাব দিয়েছিলাম ওনারা চাইলে কলকাতার বরিশালের সঙ্গে আসল বরিশালের যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি, বা বিদেশ-বাসী বরিশালের লোকেদের সঙ্গে যেমন আমেরিকায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কবি-সাহিত্যিক শ্রী ওবাইদুল্লাহ খান (সিণ্টু)। সিণ্টুদার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় আছে জানিয়েছিলাম। এছাড়া আরও অনেককে চিনি। কোনো সমিতিই ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। প্রগ্রেসিভ কনসারভেটিভে কোনো তফাত পাইনি।

এই প্রসঙ্গে কলকাতার অন্য এক ঘটনার কথা মনে পড়ে। ১৯৮৫-র ২২ সেপ্টেম্বর মৌলালীতে 'স্বাধীনতা সংগ্রামের' স্থায়ী এক্সজিবিশন দেখতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিল আমার স্ত্রী, ছেলে শুভো, মেয়ে জয়িতা। বাচ্চারা অনেক উৎসাহ নিয়ে গিয়েছিল 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স এক্সজিবিশন' দেখবে বলে। সে যাত্রায় দেখা হয়নি কারণ যে ভদ্রলোকের কাছে দরজার চাবি থাকে তিনি আসেননি। লাভ হয়েছিল আমাদের। সেদিন রাজশাহী সম্মেলনীর মিলনী সভা—জলসা হচ্ছিল। কয়েকজনের সঙ্গে গায়ে পড়েই আলাপ করেছিলাম। কয়েক ঘণ্টা যে কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছিল জানি না। রাজশাহীর কথা, কলকাতাবাসী রাজশাহীদের কথা শুনে ভালো লেগেছিল। এখানকার দেশের কথা, ফেলে আসা আত্মীয়স্বজন, গ্রামবাসী, ও হিন্দুদের অবস্থাও জানতে চেয়েছিলাম। এক ভদ্রলোক সবার সেন্টিমেন্ট প্রকাশ করে বললেন 'না, ওসব আর ভাবি না। কিছু করার নেই। ওরা সব পাল্টে দিয়েছে—এমনকি স্কুলের নাম, স্কুলের প্রাইজের নামও পাল্টে দিয়েছে। এখান থেকে কিছু করা বড়ো ডেনজারাস। এখন আমরা এখানে, মালদায় ও জলপাইগুড়িতে ছোট বড়ো

গ্যাদারিং করি।' বলেছিলাম 'আমার এক রাজশাহী বন্ধু আছেন ডাক্তার ওয়াজির আলি চৌধুরী। চাইলে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি।' তার কোনো দরকার হয়নি।

রাজশাহী যাইনি তাই বলতে পারব না। তবে আমার ধারণা আমাদের কলকাতার ডান-বাম সবাই বাংলাদেশ সম্পর্কে একাধারে কনট্রাডিক্টরি, রোমান্টিক, বায়াস্ড চিন্তা নিয়ে আছি। রাস্তা-ঘাট স্কুল কলেজের 'হিন্দু' নাম তারা যথেষ্ট বাঁচিয়ে রেখেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম পুরস্কার 'নরনারায়ণ পদক' এখনও দেওয়া হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দেওয়া হবে। বরিশালের পুরনো বি. এম. (ব্রজমোহন) কলেজের নাম পাল্টে আয়ুব খানের আমলে বি. এম্. (বেঙ্গল মুসলিম) কলেজ করার প্রস্তাব এসেছিল—স্থানীয় লোকেদের আপত্তিতেই এটা করা যায়নি। বরিশাল শহরে এ. কে (অশ্বিনীকুমার) হল পাল্টে এ. কে (আয়ুব খান) হল করার প্রস্তাব এসেছিল—স্থানীয় লোকেরাই এটা হতে দেয়নি। এ নিয়ে ব্রজমোহন ও অশ্বিনীকুমার দত্তের উত্তরাধিকারী এবং ট্রাস্টি নিউইয়র্ক নিবাসী ডঃ অশোককুমার দত্তর কাছে আয়ুব খানের সেক্রেটারিরা অনেক চিঠিপত্র দেন। অশোকদা আমাকে এর অনেক কিছুই দেখিয়েছিলেন ও বলেছিলেন, 'আমাকে আর উত্তর দিতে হয়নি। ওখানকার লোকেরাই এটা বেশিদূর এগোতে দেননি'।

জানি না দেশের স্মৃতি কতদিন আমাদের মা-বাবার জেনারেশনরা বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন, আর তার কতটাই বা দরকার আছে। 'বরিশাল সেবা সমিতি'র কথায় বুঝেছি যে ভারতে-জন্ম জেনারেশনকে তারা টানতে পারছেন না। এদের বাংলাদেশের স্মৃতি ও নস্টালজিয়া কোনোটাই নেই।

উল্লেখপঞ্জী

১. সলমন রুশদী, 'শেম এলফ্রেড এ নফ' নিউ ইয়র্ক ; ১৯৮৩, পৃ. ৭২।
২. ওপরের বাংলাদেশ আদমসুমারী থেকেও সেটা অনুমান করা যাবে।
৩. বাংলাদেশ সরকার, 'স্ট্যাটিসটিকাল ইয়ারবুক অব বাংলাদেশ', ১৯৮৩-৮৪, পৃ. ৮০ থেকে হিসাব করা হয়েছে।
৪. 'সঙ্ঘবার্তা' চৈত্র ১৩৯২, পৃ. ৪৭৪-৭৫।
৫. মৃদুলকান্তি রক্ষিত, 'দি ল অব ভেসটেড প্রপারটিস ইন্ বাংলাদেশ : 'এ

বুক অন দি কনফ্লিক্ট অব ল'জ' ডিলাক্স প্রিন্টিং প্রেস, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫।

৬. আরও আলোচনার জন্য দেখুন, রক্ষিত, পৃ ১১৮-১৯।

৭. ঐ পৃ ১১৮-১৯ :

৮. জিল্লুর আর খান 'মাইনরিটিস ইন্ বাংলাদেশ', মরভিন ডেভিস সম্পাদিত 'বেঙ্গল স্টাডিজ ইন লিটারেচর, সোসাইটি এণ্ড হিস্ট্রি', মিশিগান স্টেট ইউনিভারসিটি, ইস্ট ল্যান্সিং, ১৯৭৬, পৃ ১০১-১৩।

৯. ঐ পৃ ১১১।

১০. মহম্মদ গুলাম কবীর, 'মাইনরিটি পলিটিক্স ইন বাংলাদেশ', বিকাশ, নতুন দিল্লি পৃ ৭৬-৭৮।

১১. চঞ্চল সরকার 'বেঙ্গল মাইনরিটিস ফিল ইনসিকিওর' অমৃতবাজার পত্রিকা, মে ১৯৮১।

১২. মঃ গুলাম কবীর, পৃ ১০৬-২৫।

১৩. অধ্যাপক আব্দুল গফুর, 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়বাংলা', ঢাকা বুক মার্ট, ১৯৭৩ ; ৩৪৩-৪৪।

খ. এই বাংলা ওই বাংলা

দু দিকের টানাপোড়েন, না দু নৌকোয় পা ?

বাংলাদেশে যখনই বেড়াতে গেছি তখনই একটা কথা বারবার শুনেছি, এমনকি ভারতেও, হিন্দু-মুসলমান-ধনী-গরিব-মধ্যবিত্ত সবাইয়ের কাছে যে 'বাংলাদেশ থেকে ভালো হিন্দু সব চলে গেছে' এই কথাটা মনে হয় এতবার সবাই বলেছে যে এটা সত্যি সত্যিই সবাই বিশ্বাস করে। এটা অনেকটা নাৎসী জার্মানির গোয়েবেল্‌সের মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা করার মতো। উনি বার বার একটা মিথ্যা প্রচার করতেন যাতে মিথ্যার কিছু অংশ লোকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। এই রকম মিথ্যা প্রচার দেশ-বিদেশের বহু সরকার বা প্রতিষ্ঠান আজও করে থাকে। ভালো খারাপের ডেফিনেশন (Definition) ব্যক্তিগত, তবে আমি তো খারাপ হিন্দু খুঁজে পাইনি 'ভালো অর্থে যদি আমরা 'ভদ্রলোক' বোঝাই তাহলে তাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই কমেছে, তবুও 'ভদ্রলোক' এখনও অনেক আছেন। যাঁরা এত কষ্ট করে মাটি কামড়ে পড়ে আছেন তাঁরা 'ভালো' না যাঁরা এদের ফেলে আগেভাগে ভারতে এসেছেন এবং আছেন তাঁরা 'ভালো'। কোনো মানুষ নিজের দেশকে খুব ভালোবাসলে এইরকম ভাবে পড়ে থাকে। সেই মাপকাঠিতে বাংলাদেশে হিন্দুরা তাদের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের থেকেও বেশি দেশপ্রেমী।

আমাদের গ্রামে থাকতে প্রায় সবাই বারণ করে দিয়েছিলেন। সাধারণ ভাবে গ্রামে নিরাপত্তার অভাব। তাছাড়া গ্রামে হোটেলও নেই আর খুব পরিচিত কেউ না থাকলে কি কারো বাড়িতে ওঠা যায় ? দিনের বেলা গ্রামে থেকে রাতে শহরের হোটেলে বা বাড়িতে কাটিয়েছি। কোনো সময় লঞ্চেও রাত কাটিয়েছি। গ্রামে আশ্রয় পেয়েছি স্থানীয় লোকের কাছে। হিন্দুরাই বেশি টেনেছেন, পরে বুঝেছি অনেক মুসলমানও কাছে টানতে চেয়েছেন তবে ইতঃস্তত করেছেন আমাদের খাওয়াদাওয়ার বাছবিচার থাকতে পারে ভেবে। যখন শুনেছেন আমাদের কিছুরই বাছ বিচার নেই, তখন মিশতে অনেক সুবিধা হয়েছে, এবং তাঁরাও অনেক খোলাখুলি আলোচনা সমালোচনায় যোগ দেন। গ্রামে যাঁরা 'আশ্রয়' দিয়েছিলেন এবং যাঁদের বেস (Base) করে ঘুরেছি তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাটাযোরের মহেন্দ্র

বাবু (গোয়ালা), লক্ষ্মণকাঠির হারানবাবু (ধোপা) ও তার মেয়ে আলোদেবী, বরিশালের পূজারী মানিকবাবু ও ওষুধ সেলস্‌ম্যান অরুণবাবু, মাহিলাড়ায় রাখাল সাধু (ছালা-পরিহিত ২৫ বছরের সাধু) ও নাপিত বাড়ির কমলাদেবী যিনি ছুটে এসেছিলেন আমার স্ত্রী, সেনগুপ্তবাড়ির মেয়ে এসেছে বলে এবং শুনিয়েছিলেন ৪০ বছরের ইতিহাস যাকে বলে ওরাল হিস্ট্রি। আমাকে অবশ্য 'জামাই আদর' জানাতে ভোলেননি। এছাড়া মনে পড়ে লক্ষ্মণকাঠির চাষী শ্রীমোস্‌লেম, মাহিলাড়ার শ্রীফরহাদ, মাদারীপুরের প্রণবমঠের ব্রহ্মচারী প্রদীপ ও ব্রঃ তমাল, যশোরে আলাপ মহম্মদ নজরুল, এছাড়া কৃপাতনগরের কুলুবাবুরা। আরও অনেক অনেক লোক। বিশেষ করে ঢাকা, বরিশাল শহরে এত লোকের সান্নিধ্য ও আতিথেয়তা পেয়েছি তা ভোলা সম্ভব নয়। এছাড়া বলা দরকার বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশন ও তার ছাত্রাবাসের ছাত্ররা বিশেষ করে ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র গোপাল গঞ্জের গোলক গুহ ও বাবুগঞ্জের স্বদেশ দে, কুমিল্লার রঞ্জন দত্ত মাত্র ক'মিনিটের আলাপে যা সাহায্য করেছে তা' না বললে অন্যায় হবে। এছাড়া একসময় বরিশালে বেস করি একেবারে স্ট্রেনজার ব্যবসায়ী ও অমায়িক লোক শ্রীসুরেন নট্টর বাড়ি। অন্য অফার (offer) পেয়েছিলাম আমাদের বন্ধুর দুলাভাই মতিউরের বাড়ি। এছাড়া ঢাকায় যাদের কাছে আশ্রয় পেয়েছি তার মধ্যে আছে আমাদের বন্ধু কর্নেল রহিম, কর্নেল রসিদ, অধ্যাপিকা নাজমুন্নেসা ও রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অক্ষরানন্দ।

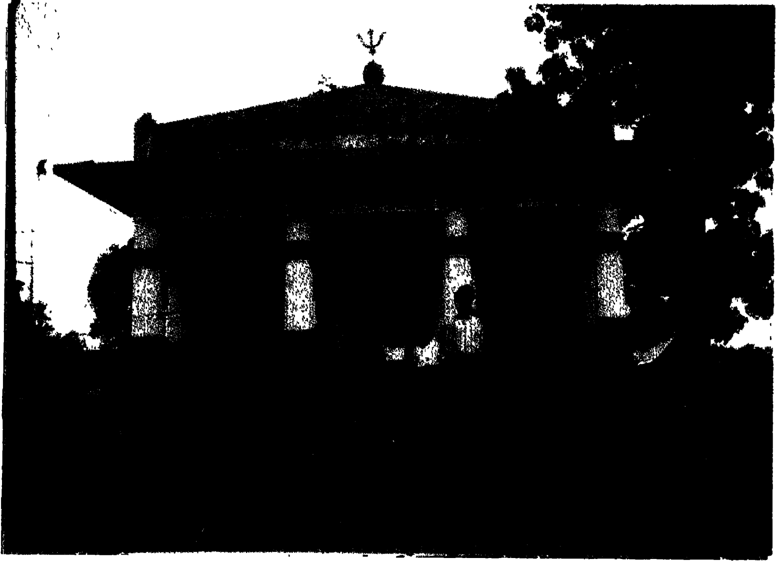
সত্যি কথা বলতে কি বাংলাদেশিদের অতিথিপরায়ণতা ও আপ্যায়ন নিয়েই আলাদা করে লেখা উচিত। বিদেশেও আমাদের দুদিকের লোকেদের তফাতটা চোখে পড়ে। আমাদের বাংলাদেশি বন্ধুরা যখন কলকাতায় যান তখন তাদেরও কলকাতাবাসীদের আতিথেয়তা খুব কটু লাগে। কিছুদিন আগে যখন ঢাকায় যাই তখন এই ব্যাপারে একজন একটা জোক (joke) বললেন। বললেন, 'কলকাতায় কোনো বাড়িতে গেলে তাঁরা ভদ্রতা দেখিয়ে বলেন চা না খেয়ে কিন্তু যেও না' অর্থে, চা খেয়ে যেন আর থেকো না। আর ঢাকায়? সেখানে বলে 'চা খেয়ে কিন্তু যেও না।' ছোটবেলায় জগদ্বন্ধু স্কুলে ঘটি-বাঙাল তামাশার কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। এটা ঠিকই বাংলাদেশে কোনো জায়গাতেই শুধু চা খেয়ে ছাড়া পাইনি। দুএক জায়গায় বাড়ির গৃহকর্ত্রীকে না বলেই পালিয়ে আসতে হয়! আগের কোনো সম্পর্ক ছাড়াই পথের আলাপে বোধহয় লোকেদের আন্তরিকতা আরও বেশি অনুভব করেছি।



. মাহিলাড়া গ্রামে নাপিত বাড়িব কমলা মাসিমা, লেখকের স্ত্রী শেফালী ঘোষ দস্তিদারকে পূর্বের চল্লিশ বছরের ইতিহাস শোনাচ্ছেন



. লক্ষ্মণকাঠি গ্রামে। বাঁদিকে প্রথম রাখাল সাধু। এক সময় উনি আমাদের আশ্রয় দেন বাঁদিক থেকে পঞ্চম খালি গা, লক্ষ্মণকাঠি গ্রামে আমাদের আশ্রয়দাতা হারাণবাবু।



. বরিশালে চারণ কবি মুকুন্দ দাস প্রতিষ্ঠিত কালী বাড়ি। বাঁয়ে লেখকের স্ত্রী, মাঝে গোলক ও ডানদিকে স্বদেশ - ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র।



. কৃপানগরের সঙ্গী। বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় শ্রীমোসলেম, চতুর্থ শ্রীসুভাষ কুলু, পঞ্চম শ্রীমণীন্দ্র ঘরামী, সপ্তম শ্রীনগেন কুলু। এ ছাড়া স্বদেশ ও গোলক বি.এম কলেজের ছাত্র।

একবার ঢাকায় গিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমাদের পরিচিতা ক্যালকাটা উইমেন্‌স পলিটেক্‌নিকের প্রিন্সিপাল, ইন্‌জিনিয়ার শ্রীমতি ইলা ঘোষের সঙ্গে। ইলাদি তখন ওখানে ঢাকা উইমেন্‌স পলিটেক্‌নিক তৈরির ইউনাইটেড নেশনস্‌ এর উপদেষ্টা। আমার ঘোরা ও লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ দেখে বললেন 'এত দিন ঢাকায় আছি আলাপ হয়েছে অল্প কজনের সঙ্গে, হিন্দুদের সঙ্গে তো আরও কম, তোমার কি করে এত লোকের সঙ্গে আলাপ হলো?' মনে মনে বলেছিলাম ঠিক জানি না। পরে ইলাদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম আমাদের বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ নাজমুন্নেসা ও ওনার স্বামী এফ, ইউ, মহতাবের সঙ্গে, ঢাকার জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট ও আগে আমেরিকায় আমার সহকর্মী ডঃ ললিতমোহন নাথ, স্বাধীনতা যুদ্ধে খ্যাত ও মহানগর কমিটির জেনারেল চিত্তরঞ্জন দত্ত, বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বিলায়েত হোসেন তালুকদার, শেখ মুজিবের আমলের আওয়ামিলীগ সংসদ সদস্য সুধাংশুশেখর হালদার ও আরও অনেকের সঙ্গে।

আমাদের বৃহত্তর বাঙালি সমাজে কতকগুলো পরস্পর বিরোধী চিন্তা-ভাবনা আছে তার ফলে ভুগছেন বোধহয় দুদেশের সংখ্যালঘুরা। এখানে আমি বাংলা-দেশের কথাই লিখছি। বাংলাদেশে যে সব হিন্দু আছেন, তাঁদের ওপর সংখ্যাগুরু মুসলমান সমাজের থেকে যতই চাপ থাক না কেন তার সঙ্গে আছে ভারতে চলে আসা আত্মীয় বন্ধু পড়শীদের চাপও। চেনা পরিচিত সবাই ভারতে আসার জন্য লোভ দেখান। অধ্যাপক মণিরুজ্জামানের উদাহরণ মতো পলিটিশিয়ানদের ম্যানি-পুলেশনের সমান। অনেক সময় বাংলাদেশে থেকে গেলে একঘরে (Defacto) হচ্ছেন। ভারতে আসা সব বাঙালই অভিযোগ করেন যে বাংলাদেশে থেকে যাওয়া হিন্দুরা 'মুসলমানী' হয়ে যাচ্ছেন। ঠিকই। অর্থাৎ কথাবার্তায় ও পোশাকে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের মতো হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এই রকম বেশ কয়েকজনকে দেখেছি বাংলাদেশে হিন্দুরা 'বৌদি'কে 'ভাবী' সম্বোধনে আপত্তি করলেও 'মাসিকে আন্টি বললে আপত্তি করেন না। সকালের 'জলখাবার'-এর বদলে 'ব্রেকফাস্ট' পছন্দ করেন 'নাস্তা' নয়। 'চা' এর বদলে 'টি' পছন্দসই, 'জলে'র বদলে 'পানী' কোনোমতেই নয়। বাংলাদেশে হিন্দুদের পরিবর্তনটা খুব তাড়াতাড়ি হয়েছে তার কারণ তাদের পাড়া বা গ্রাম ভিত্তিক সমাজ ও সাব্‌কালচারটা ভারতে লোক যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেছে। লোকে যখন বাড়িঘর ফেলে ভারতে এসেছেন, সেখানে বসবাস শুরু করেছেন মুসলমানেরা, সেইজন্যই পাড়া বা গ্রাম ভিত্তিক

সমাজও ভেঙে গেছে। এটাকেই হিন্দুরা বলে 'আমাদের ইন্‌সটিটিউশনগুলো ভেঙে যাচ্ছে'। বদরুদ্দিন উমর, 'পূর্ববাংলার সংস্কৃতির সংকট'-এ লিখেছেন 'ইংরেজ-পূর্ব যুগে ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমূহেই ছিল তার সমাজ ও আর্থিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র। এ গ্রামগুলি ছিল দ্বীপসদৃশ এবং সারা ভারতবর্ষ ছিল এক বিশাল দ্বীপপুঞ্জ।...ভারতের সাধারণ গ্রাম্য জীবনযাত্রার মধ্যে বিপুল সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও গ্রামসমূহের মধ্যে কোনো বিশেষ পারস্পরিক প্রয়োজনগত যোগাযোগ ছিল না'।[১] নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর 'অ্যান অটোবাওগ্রাফী অব অ্যান আননোন ইন্‌ডিয়ান' বইতে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের ময়মনসিংহের গ্রামেরও এই চিত্র ফুটে ওঠে।[২] হিন্দুদের ক্ষেত্রে এখন আর এই দ্বীপগুলো নেই। সেটাই তাদের মুশকিল হয়েছে। পশ্চিমবাংলা থেকে এভাবে উজাড় করে লোক বাংলাদেশে যায়নি বলেই পাড়ায় বা গ্রামে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ক্ষেত্রেও এই দ্বীপগুলো বর্তমান আছে।

ভারতে বাঙালরা তাদের ফেলে-আসা পরিবারকে বাঙালদের শুধু সাফল্যটা তুলে ধরতে গিয়ে তার আর একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছেন। ওখানে অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা যে ভারতে এলেই সবাই সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। কলকাতার অফিস-আদালত স্কুল-কলেজ দেখলে সেটা মনে হতেও পারে। আমার খুব আশ্চর্য লেগেছে বাংলাদেশে মুসলমান-হিন্দু সবাই বাঙালদের সাফল্যের কথা খুব ভালো করে রাখেন। আমি অনেক হিসেব ওদেশে বা আমেরিকায় বাংলাদেশিদের কাছ থেকে জেনেছি। হয়তো এর সবটাই গুজব ও ভুল তাও লিখছি। যেমন—জ্যোতি বসু ঢাকার লোক, সুচিত্রা সেন পাবনার, প্রমোদ দাসগুপ্ত ফরিদপুরের, ত্রিগুনা সেন সিলেটের, চিত্রা সিং ফরিদপুরের, দেবব্রত বিশ্বাস ঢাকার, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী ও রবি ঘোষ বরিশালের, এবং হাজারো নাম। ঠিক-বেঠিকের কে খোঁজ রাখে? ডমিনিক লাপিয়েরের কলকাতার 'সিটি আর জয়'এর মতে আমাদের দেশে সবাই সুখের খবরের হিসাবটাই রাখেন। এর সঙ্গে বাঙালদের নস্টালজিয়ার গল্প সব মিলে যেন বাংলাদেশের হিন্দুদের ন্যাচারাল, পেইনলেস ও ভলানটারি সাকসেস স্টোরি। অনেকটা 'সুখের সংসার' গড়ার জন্য 'ইউরোপ আমেরিকা' পাড়ি দেওয়ার মতো।

ওপারে অনেকেই খোঁজ রাখেন যে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এলে লোকেরা তাদের নিজের মামা-দাদা-কাকার মাধ্যমে জমি-জমা থেকে কাজকর্ম পেয়ে যান। এটাও অনেকে জানেন যে নিজের আত্মীয়স্বজন না থাকলেও কংগ্রেস কমিউনিস্ট পার্টি মারফত রেশন কার্ড, পাসপোর্ট, কাজ-কর্ম সবই জোটানো যায়।

যেমন ২১ নভেম্বর 'বর্তমান' পত্রিকায় বিজয়গড় কলোনীর সম্পর্কে একটা খবর (পৃ. ৩):

"অঞ্চলের অধিকাংশ বাসিন্দাই পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছেন।...কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যক্ষ মদতে এলাকার অনেক বাড়ি সি. পি. এম. সমর্থকরা জবরদখল করেছেন বলে স্থানীয় অঞ্চলবাসীদের অভিযোগ।...আঞ্চলিক কমিটির সদস্য এবং সি. পি. এমের যুবনেতা প্রণব রায় এরকম একটা বাড়িতে আছেন। শ্রীরায় আগে কুলেন্দুবাবুর বাড়িতে থাকতেন। উক্ত ঠিকানার প্রকৃত বাড়ির মালিক স্নেহলতা দেবী নিঃসন্তান অবস্থায় বছর তিনেক আগে মারা গেলে কুলেন্দুবাবুর সহায়তায় শ্রীরায় ওই বাড়িটি দখল করে...শোনা যাচ্ছে 'রিফিউজি রিহ্যাবিলেটশন ডিপার্টমেণ্ট' থেকে শ্রীরায়ের নামে কুলেন্দুবাবু উক্ত বাড়ির 'লীজ' দলিল বের করেছেন। সত্তর সালে শ্রীরায় বাংলাদেশ থেকে এ অঞ্চলে এসেছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ সি. পি. এম. পার্টির কর্মী হওয়ার দরুন শ্রীরায় আগে-ভাগে বাড়ি গুছিয়ে নিয়েছেন। অথচ অনেক পুরনো উদ্বাস্তু এখনও বাড়ি পাননি"।[৩] যদি কেউ কমিউনিস্ট মতবাদেই বিশ্বাস করেন তাহলে তারা নিজের দেশের 'ছোটজাত' ও 'খারাপজাত'দের ফেলে অন্যদেশে শোষণমুক্তর কথা বলবে ও সঙ্গে সঙ্গে গুছিয়ে নেবে এটা করলে তো সবারই মুশকিল,—সমাজবাদেরও। এটাই কি আমাদের না-খেটে পাওয়া বা কুইকরীচের হওয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য? শ্রীরায়ের কথা নমুনা মাত্র। চেষ্টা করলে এই রকম অনেক রায়কে রামগড়-বিজয়গড়-গড়িয়া-যাদবপুর থেকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশে যে সব হিন্দু নেতৃত্ব দিয়েছেন যেমন, ত্রৈলক্য মহারাজ, মণি সিং, সুখেন্দু দস্তিদার, মনোরঞ্জন ধর, রণেশ দাসগুপ্ত, জীতেন ঘোষ, মণিকৃষ্ণ সেন, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, নলিনী দাস, খোকা রায় এবং আরও অনেকে তাঁরা সাধারণ ভাবে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিতে চেয়েছেন—হিন্দুদের নয়। মুশকিল হয়েছে যে সারা-বাংলাদেশ রাজনীতির পাশেই থেকে গেছেন, সেইসঙ্গে হিন্দুদের সুবিধা-অসুবিধার কথাও বলতে পারেননি। এই সত্তর আশি দশকের কিছু হিন্দু নেতা সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া নিজেদের বাঁচার বা সেলফ্ ডিটারমিনেশনের ইস্যুটা তুলে ধরতে শুরু করেছেন। সেখানের হিন্দু নেতারা প্যালেসটাইনের পি. এল. ও, দক্ষিণ আফ্রিকার আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস, আমেরিকার মার্টিন লুথার কিং, এমনকি শ্রীলঙ্কার তামিল ও পাঞ্জাবের খালিস্তানিদের মতো বলতে চাইছেন 'উই আর হিয়ার টু স্টে'। 'ভারতে যাওয়াটাই সমস্যার

সমাধান নয়। আমাদের পশ্চিমবাংলার রাজনীতিবিদ, পার্টি বা বুদ্ধিজীবীদেরও সেটা মনে করানো দরকার। সুখের কথা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আসামে যাদের তাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে তাদেরকে 'মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে' উপদেশ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের হিন্দুদেরও সেই কথা বলা দরকার, আমাদের বড়ো বড়ো নেতাদের। আমার ধারণা বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানরাও এতে খুশি হবেন। এছাড়া সেখানে হিন্দুদের প্রতি যখন অবিচার হয় সেটাও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে গিয়ে বলা দরকার—এতেও বাংলাদেশিরা অখুশি হবেন না বলেই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস। আর সেখানে যদি সংখ্যালঘুদের ওপর অপ্রেশন ও ডিসক্রিমিনেশন বাড়ে তবে অবশ্যই তাদের জন্য আমাদের জায়গা করে দিতে হবে এটা বলা বাহুল্য।

প্রত্যেকে ধরে নেন হিন্দুরা সবাই 'ভারতমুখী' এবং আনকনশাস্‌লি ধরে নেয় তাদের লয়ালটি ভারতের জন্য। সেই কারণেও অনেকের চোখে 'ভারত' ও 'পশ্চিমবাংলা' হিন্দুদের জায়গা বা 'হিন্দুস্তান' হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দুদের লয়ালটি কোয়েশ্চেনড' (loyality questioned) হওয়ার দরুন তাদের উঁচু পজিশনে ওঠাও মুশকিল অনেক সময়—বিশেষ করে তাদের আত্মীয়স্বজন কলকাতায় থাকলে ব্যাপারটা আরও মুশকিলের। বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক হিন্দুপরিবারই দুদেশের মধ্যে বিভক্ত। এ. কে. এম্. আমিনুল ইস্‌লাম 'ভিকটোরিয়াস ভিক্‌টিম'এ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মিলিটারি ও শাসনব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন যে "একজন হিন্দু সিনিয়র মিলিটারি অফিসার যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেন, তাঁকে প্রমোশন দেওয়া যায়নি, তার কারণ তাঁকে ধরা হয় তিনি 'ভারত থেকে এসেছেন' এবং তাঁর ধর্ম ও ভারতীয়দের ধর্ম একই। এবং এই অফিসারের থেকে অন্য জুনিয়র অফিসাররা তাড়াতাড়ি প্রমোশন পান।"[৪] হিন্দুরা আশা করেছিলেন যে বাংলাদেশ হওয়ার পর তাদের লয়ালটি প্রশ্ন করা শেষ হবে এবং তাদের কো-অপ্‌ট্ বা সমাজে টেনে নেওয়ারও চেষ্টা হবে। দুঃখের কথা সে আশা এখনও মেটেনি! ১৯৪৭-এর দ্বিতীয় বাংলা ভাগের আগে ও পর থেকে বিভিন্ন নেতা এবং তাদের সঙ্গে অন্য হিন্দুরা চলে আসাতে এখনকার হিন্দুদেরও খেসারত দিতে হচ্ছে। মহম্মদ কবীর 'মাইনরিটি পলিটিক্স ইন বাংলাদেশ'-এ অন্য জায়গায় লিখেছেন '১৯৪৭-এর জুন ও জুলাই থেকে 'মাস মাইগ্রেশন' (mass migration) শুরু হয়।...মুসলমানরা মনে করেন হিন্দুরা তাদের (নতুন) দেশের ভিটে নরম করে দিতে চাইছে। হিন্দুদের তারা 'ডিভাইডেড লয়ালটি' আছে বলেন।...[৫]

'এই সব অভিযোগের একটা বড়ো কারণ হলো প্রায় বেশির ভাগ সংখ্যালঘু নেতারা তাদের পরিবারের এক অংশকে ভারতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। অনেকে আবার পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিতেন। একজন হিন্দু সমালোচক স্বীকার করেন যে ১৩ জন হিন্দু পাকিস্তান সংসদ সদস্যের মধ্যে ছয়জন পাকাপাকিভাবে কলকাতায় থাকেন। ওই একই কারণে খুব অল্প সংখ্যক আইন সভার সদস্য পাকাপাকিভাবে পূববাংলায় বাস করেন। এই কলকাতাবাসী সদস্যরা ঢাকা ও করাচীতে যান যখন সেখানে এসেম্বলি বসে, এদের (দেশের প্রতি) আনুগত্য এসেমব্লিতেই উত্থাপন করা হয়।'[৬] এ তো গেল পুরনো দিনের কথা। এই চিন্তাধারাই খুঁজে পেয়েছেন অধ্যাপক তালুকদার, মণিরুজ্জমান। 'দি ফিউচার অব বাংলাদেশ'-এ লিখেছেন, "বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত ও উঁচুবর্ণের হিন্দুরা তাদের বয়স্কদের রেখে আর সবাইকে কলকাতা পাঠিয়ে দেন···। এই উঁচু বর্ণের হিন্দুরা চলে গেলে এক দিক দিয়ে হয়তো ভালো হবে কারণ উঁচু ও নিচুবর্ণের হিন্দুদের মেলামেশার থেকে নিচুবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বোঝাপড়া বেশি ভালো।"[৭] ভাবতেও খারাপ লাগে যে ১৯৮০তে আমাদের মধ্যে 'উঁচু ও নিচু'র বোঝাপড়ার তফাত থাকতে পারে—অন্তত একজনেরও সেটা মনে হতে পারে। বাংলাদেশে গিয়ে কিন্তু আমার তা' মনে হয়নি, বরং হিন্দুদের মধ্যে 'উঁচু-নিচু'র বোঝাপড়া—সামাজিকতা পশ্চিমবাংলার মতই বা তার থেকেও ভালোই। সবাই বলেছেন যে 'এছাড়া আমাদের বাঁচার উপায় নেই'।

গত চল্লিশ বছরে বার বার হিন্দু-বিরোধী পোগ্রোম (রায়ট) হওয়ায় হিন্দুদের অনেকের মধ্যবিত্ত সহ গরিবদেরও, মাটির সঙ্গে যোগটাও কিছুটা কমে এসেছে। তাদের অনেকে ফুট-লুজ (Foot-loose), ভূমিহীন ও লঙ্গর-বিহীন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সাধারণভাবে আমরা কেউই শত-শত বছরের ধরে থাকা বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে-বাড়ি চট করে ছাড়ি না। কিন্তু ইদানীং আমার কাছে যেটা এলারমিং (alarming) লেগেছে সেটা হলো বাংলাদেশে হিন্দুরা তাদের গ্রামের ভিটে-বাড়ি, অনেক ক্ষেত্রে শহরের পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে একেবারে ভাড়াটে হয়ে গেছেন—যেন বাংলাদেশের সঙ্গে স্থাবর যোগাযোগ রাখতে দ্বিধাগ্রস্ত। মানসিক বা সাংস্কৃতিক নয়। কারণ খুবই জটিল—তবে ওই 'শত্রু সম্পত্তি আইন'-এর প্রকোপ, অনেক ক্ষেত্রে জোর করে ও ভয় দেখিয়ে জমি-সম্পত্তি নেওয়া, লুঠতরাজ, সর্বোপরি বাংলাদেশ হওয়ার পরে—বিশেষ করে মুজিব হত্যা ও সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে—একটা যেন রুড এওয়েকেনিং (rude awakening) নতুন

করে উপলব্ধি করেছেন যে তাদের সংখ্যালঘুদের সমস্যার যেন আর শেষ নেই। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় প্রায় সব হিন্দুদেরই বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট লুঠ হয় (তুলনায় মুসলমানদের হয়েছে নগণ্য)। নতুন উদ্যমে নিজেদের যেভাবে এবং অল্প সময়ে এবং অন্যের উপর নির্ভর না করে তাঁরা দাঁড়াতে পেরেছেন তা' অভূতপূর্ব এবং ভাবতেও ভালো লাগে। কিন্তু ভবিষ্যতে বাংলাদেশে যদি রাজনীতি খারাপের দিকে যায় তাহলে এই ফুট-লুজ লঙ্গর-বিহীন দলই সবচেয়ে আগে ভারতে আসতে বাধ্য হবেন। বাংলাদেশ রুরাল এড্‌ভান্সমেণ্ট কমিটির প্রকাশিত 'হু গেট্‌স্‌ হোয়াট এণ্ড হোয়াই' বইয়ে দু-একটি হিন্দু পরিবারের প্রথমে জমি-ভিটেহীন, পরে লঙ্গর-বিহীন হওয়া ও ভারতে যাওয়ার চেষ্টার আলোচনা আছে। এতে ঢাকার মানিকগঞ্জের কাছে ধানকুরা গ্রামের গরিব কুমার, শ্রীমণীন্দ্রকুমার দাস, সামান্য ভিটেমাটি বিক্রি করে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা, ১৯৭৯ সালে ও তার কুফল-এর ওপর সামান্য আলোকপাত করা আছে।[৮] একটা দুঃখের কথা যে বাংলাদেশে আজকাল অনেক হিন্দু তাদের সত্তাটা জানাতেই দ্বিধাগ্রস্ত! বরিশালের মানিকবাবু অনেক দুঃখ করে বলেছিলেন 'জানেন এখন অনেক সময় নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে সংকোচ হয়। তবে 'সংকোচ হলেও' মানিকবাবু ঠিক করেছেন নাস্তিক বা মুসলমান না হয়ে, বা কলকাতা-আগরতলাতে গুছিয়ে না বসে সংসারধর্ম ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বাংলাদেশেই থাকবেন ও নিপীড়িত হিন্দুদেরই সাহায্য করবেন।

আশাকরি দুদেশের মধ্যে আদান-প্রদান যত বাড়বে তত বোঝাপড়ায় সুবিধা হবে। বই-পত্র, কাগজ, সিনেমা, টিভির আদান-প্রদান সব কিছুই সাহায্য করছে।

দুদেশের কয়েকটা সাংস্কৃতিক গ্রুপ অন্যের দেশে যাচ্ছেন এখন। একটা গ্রুপ অন্যদিকে যান পরিবারের লোকজনকে দেখতে। এঁরা সাধারণতঃ কোনো এক গ্রাম বা বাড়িতে যান সরাসরি এবং সেখান থেকেই ফেরত আসেন। দ্বিতীয় গ্রুপ হলো গণ্যমান্য ব্যক্তিরা -- মন্ত্রী, গায়ক, খেলোয়াড়, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, রিসার্চার, সাংবাদিক—যান সেমিনারে, কনফারেন্সে ও সরকারি-বেসরকারি আমন্ত্রণে। এনারাই আমাদের নতুন সেতু। তবে এদের বেশি সময়ই কাটে 'গাইডেড্ ট্যুর'-এ। তৃতীয় আরেকটা গ্রুপ আছে তারা হলো টুরিস্ট। এই ব্যাপারে ভারতীয় বাঙালিরা ভারতে সর্বপ্রথম হলেও বাংলাদেশ দেখার ব্যাপারে পিছিয়ে আছেন। বাংলাদেশিয়রা আমাদের থেকে অনেক বেশি কলকাতা, পশ্চিমবাংলা ও ভারত দেখতে আসেন। আরেকটা গ্রুপ আছে ব্যবসাদার। ব্যবসার

কাজেও বেশি বাংলাদেশি ভারতে আসেন আমাদের থেকে। পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতির অনেক বেশি খোঁজখবর রাখেন বাংলাদেশিরা, আমাদের থেকে তাদের সিনেমা-কাগজ সম্পর্কে। তবু বাংলাদেশ টেলিভিশন মারফত আমরা বাংলা-দেশকে একটু জানতে পারছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'দুদেশ বা হিন্দু-মুসলমানকে সবচেয়ে কাছে কোন জিনিস এনেছে?' বলেছিল, 'ভিডি'ও। একটু আশ্চর্য হওয়াতে বললে 'এমনকি কট্টর ইসলামপন্থীরাও মালাউনের ছবি দেখে। এবং ভালোও লাগে। তাতে তাদেব আপনাদেরকে বুঝতে সুবিধা হয়েছে, এবং আমাদের দেশের হিন্দুদেরও'। বাংলাদেশ বিমানের কল্যাণে অল্পসংখ্যক ভারতীয় বাঙালি ঢাকা হয়ে ইউরোপ. আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছেন। এতেও মঙ্গল। তবে ভ্রমণ-রসিক পশ্চিমবঙ্গীয়দের একটা ছোট সংখ্যাও যদি ভিসা-পাসপোর্টের কাঠখড় পেরিয়ে বাংলাদেশ দেখতে যেতেন তাতে আমরা সবাই লাভবান হতাম।

উল্লেখপঞ্জী

১. বদরুদ্দীন উমর, 'পূর্ববাংলার সংস্কৃতির সংকট', নবজাতক প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ. ১৩৬।
২. নীরদ সি চৌধুরী, 'দি অটোবায়োগ্রাফী অব এ্যান আননোন ইণ্ডিয়ান', ইউনিভারসিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, বার্কলে ১৯৬৮ (প্রথম প্রকাশ ১৯৫১)। বিশেষ দ্রষ্টব্য। তৃতীয় অধ্যায় 'এনটার ন্যাশনালিজম', পৃ. ২১৮-৩২।
৩. 'বর্তমান' পত্রিকা. নভেম্বর ২১, ১৯৮৬, পৃ. ৩।
৪. এ. কে. এম. আমিনুল ইস্‌লাম, 'ভিকটোরিয়াস ভিকটিম', রিচার্ড এল্ পার্ক সম্পাদিত 'প্যাটার্নস অব চেঞ্জ ইন মডার্ন বেঙ্গল', মিশিগান স্টেট ইউনিভার-সিটি, ইস্ট ল্যান্‌সিং, ১৯৭৯, পৃ. ১৪৯-১৫০।
৫. ওপরে উল্লিখিত, মহঃ গুলাম কবীর, পৃ. ১৩-১৫।
৬. ওপরে উল্লিখিত, মহঃ গুলাম কবীর, পৃ. ৩৭।
৭. তালুকদার মণিরুজ্জমান, দি ফিউচার অব বাংলাদেশ', এ. জেয়ারত্নম উইলসন ও ডেনিস ডালটন সম্পাদিত, 'দি স্টেটস্ অব সাউথ এশিয়া: প্রবলেমস অব ন্যাশনাল ইনট্রিগ্রেশন, সি, হারস্ট এণ্ড কোং, লণ্ডন, ১৯৮২, পৃ ২৬৯।
৮. বাংলাদেশ রুরাল ডেভ্‌লপমেণ্ট কমিটি, 'হু গেটস হোয়াট এণ্ড হোয়াই', ঢাকা, পৃ. ৯৪।

দু দিকের দৃষ্টিকোণ

আমাদের দুই দেশের মধ্যে দৃষ্টিকোণের তফাত বেশ কিছু বিষয়ে যেটা লেখা দরকার বলে মনে হয়। আগে দু-একটা লিখেছি অবশ্য। এ ধরনের প্রবন্ধে সব খুঁটিয়ে লেখা সম্ভব নয়, তবুও কিছু কিছু না লিখলে এই লেখা বুঝতে অসুবিধা হবে, লেখাও অসম্পূর্ণ থাকবে, তাছাড়া অনেকে আমাকে অহেতুক ভুল বুঝবেন।

এ বিষয়ে প্রথমেই লিখতে হয় দ্বিতীয় বাংলা ভাগ বা ১৯৪৭-এর পার্টিশন। যদিও এটা অনেকদিনের ঘটনা এবং এর পরের চুয়াল্লিশ বছরে প্রায় দুটো জেনারেশন হয়ে গেছে, তবুও এখনও অনেকে জীবিত আছেন যাঁরা এটা নিজের চোখে দেখেছেন এবং ভুক্তভোগী তাই এ কথা লিখছি। এছাড়া পশ্চিমবাংলা, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও বাংলাদেশে দেশ ভাগের ফলে সমস্যা আরও জটিল হয়েছে। সেটা অস্বীকার করলে বাস্তবকেই অস্বীকার করা হবে। দুই 'দেশ' হওয়াতে লোক ও বই-পত্র তথ্যাদি (ইনফরমেশন) যাওয়া-আসা নিয়ে জটিলতা বরাবরই রয়েছে।

ভারতীয়রা, পশ্চিমবঙ্গীয়রা এবং হিন্দুরা প্রায় সবাই দেশভাগের 'দোষগুণ' খুঁজতে গেলে তাঁরা সাধারণত কায়েদ-এ-আজম মহম্মদ আলী জিন্না মুসলিমলীগ ও মুসলমানদের জাতীয়তাবাদ ও পরে বিচ্ছিন্নতাবাদকেই 'দায়ী' করেন। ভারতীয় বাঙালিরা অবশ্য এর সঙ্গে দায়ী করেন মহাত্মা গান্ধীকে। যদিও প্রাক্-স্বাধীনতা আমলে কংগ্রেসের প্রতিনিধি মোহনদাস গান্ধী মুসলিমলীগের দাবির সমর্থন না করলেও বাংলার বামপন্থীরা তা সমর্থন করেন। অন্যদিকে অনেক বিদেশি, বিশেষত অনেক মুসলমান মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী পার্টিশনের জন্য 'দায়ী' করেন হিন্দুদের। এঁদের বক্তব্য ১৯৪৭-এ হিন্দু বাঙালিরা ইচ্ছা করলে ভারত থেকে আলাদা হয়ে দুই বাংলা মিলে যুক্ত ও স্বাধীন বাংলা করতে পারতেন। বাংলা দেশের অতি পরিচিত রাজনীতিবিদ যিনি ব্রিটিশ আমলে পাকিস্তান আন্দোলন ও পরে বাংলাদেশি স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন, এই রকম একজন হলেন শ্রীঅলি আহাদ। তিনি তাঁর 'অটোবাওগ্রাফি' জাতীয়

রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫-এ অনেকেরই এই চিন্তা ধারা ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন 'বঙ্গীয় মুসলিমলীগ (সোহারাওয়ার্দী ও নাজীমুদ্দিন) ও বঙ্গীয় কংগ্রেস (শরৎ বসু) নেতৃবৃন্দ ঐক্যভাবে স্বাধীন অখণ্ড বঙ্গ-আন্দোলন প্রয়াসে লিপ্ত থাকাকালীন অবাঙালি হিন্দু নেতা কৃপালনী, নেহেরু ট্যাণ্ডন, প্যাটেল, চরম সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহাসভা নেতা বঙ্গসন্তান শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সৃষ্ট বঙ্গভঙ্গ দাবিকে সর্বভারতীয় প্রবল হিন্দু দাবিতে পরিণত করেছিলেন।'

'পরিহাস ও পরিতাপের বিষয় যে, হিন্দু সম্প্রদায় ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করার উদ্দেশ্যে ভারতে ও ভারতের বাহিরে এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন করিয়া সম্রাট পঞ্চম জর্জকে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করিতে বাধ্য করাইয়াছিলেন, সেই হিন্দু সন্তানরাই ১৯৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গ দাবিতে সমগ্র হিন্দু ভারতকেই প্রকম্পিত, করিয়া তুলিল'।[১]

এই ব্যাপারে জিন্না-সহ কেন্দ্রীয় মুসলিমলীগ তখনকার বঙ্গীয় মুসলিমলীগের 'অখণ্ড বাংলা' রাখার কোনো প্রস্তাবেরই কর্ণপাত করেননি, তবুও শ্রীআহাদের মতো বেশিরভাগ লোকেই হিন্দু ও কংগ্রেসদের 'দোষ' দেন। বরাবরই পূর্ববাংলায় কংগ্রেসকে পার্টিশন বিরোধী ও হিন্দু পার্টি হিসাবে ধরা হতো। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামদের প্রতি সেখানে অন্তত দুরকম মনোভাব আছে। একদিকে বামের প্রতি সফ্‌ট-কর্নার (soft corner) কারণ বামের পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন ও কংগ্রেস বিরোধিতা। আবার অন্যদিকে বামপন্থীদের সমালোচনাও করেন, কারণ লাখে লাখে হিন্দু বামপন্থী দেশ ছেড়ে যাওয়াতে এঁদের অনেকে বলেন বামপন্থীরাও মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও আদতে এঁরা হার্ডকোর (hard-core) হিন্দু এবং সেই কারণেই এঁরা ভারতে গেছেন—সুযোগ সন্ধানে, যেন উপনিবেশ গড়তে, উদ্বাস্তু হয়ে নয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের ইন্টারেস্ট এই বাঙালরা ভারতে তুলে ধরবেন। "ফারাক্কার পানি আপনাদের কলকাতার কোনো দরকার নেই," "তিস্তার পানির পশ্চিমবাংলার দরকার নেই" থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা সমস্যা, পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা, তালপাট্টি সব কিছুই ভারত সরকার তৈরি করেছে এবং পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরার সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে একমত, ভারতের সঙ্গে নয়। এই সুর কয়েকবার শুনেছি। বাঙালি বিরোধী অসম, ত্রিপুরী, কামতাপুরী, ঝাড়খণ্ড ও গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনের মুখে এসব লেখাও মুশকিল। না বললেও যা দেখেছি ও শুনেছি সেটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং এ নিয়ে খোলা মনে আলোচনা না করলে পশ্চিমবাংলাতেও সমস্যা বাড়তে পারে। দ্বিধাগ্রস্ত

হয়েই লিখছি এবং আশাকরি আউট-অব কনটেক্সট (out-of context) এই লেখাকে অপব্যবহার করবেন না।

অধ্যাপক মণিরুজ্জামান তাঁর লেখা 'দি ফিউচার অব বাংলাদেশ' (১৯৮২)-এ শ্রীঅলি আহাদের মতোই মত প্রকাশ করে লিখেছেন "পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান সংখ্যাগুরুদের শাসনের ভয়ে হিন্দু বাঙালিরা জোর করে ১৯৪৭-এ বঙ্গভঙ্গ করেন" মুসলমানদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। তিনি আরও লিখেছেন যে "বাংলাদেশের ইনট্রিগ্রেশনের একটা বড়ো সমস্যা হলো সাম্প্রদায়িক টেনশন। সংখ্যাগুরু মুসলমানদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু হিন্দুদের অবিশ্বাস করেন। দেশগড়ার ক্ষেত্রে এই অবিশ্বাস ক্ষতিকারক। যদিও বাংলাদেশ হওয়ার পরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়নি, তবুও উঁচুবর্ণের হিন্দু যারা হিন্দুদের প্রায় অর্ধেকের মতো তারা সংখ্যাগুরু মুসলমানদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাদের সবাই সন্দেহের চোখে দেখে। মুসলমানরা মনে করেন যে হিন্দুরা ভারতের প্রতিবেশী অনুগত, বাংলাদেশের চেয়ে।"[২] এর সামান্য সত্যি হলেও হিন্দু-মুসলমান, পশ্চিমবাংলা-বাংলাদেশ সবার কাছেই, বিশেষত বাঙালদের কাছে, ক্ষতিকারক ও লজ্জাকর।

পরলোকগত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর-রহমানের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান বদলে ইস্‌লামী সংবিধান করা, 'অ্যাবসলিউট ফেথ এণ্ড ট্রাস্ট ইন দি অলমাইটি আল্লাহ', নতুন করে দেশকে আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদন হিন্দুদের বাংলাদেশের নেতাদের প্রতি আস্থা বাড়ানোর কথা নয়। এই নতুন সংযোজন লোকে শুধু ভারত-বিরোধী হিসাবে দেখেনি দেখেছে হিন্দু বিরোধী হিসাবেও। জেনারেল জিয়া অবশ্য হিন্দুদের আশ্বস্ত করার জন্য বিভিন্ন শহরে হিন্দুদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সিটিং করেন।

অনেকেই বলবেন অত পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি? লিখছি কারণ সেই পুরনো সত্য-মিথ্যা অনেকের মনে এখনও রয়েছে, এমনকি যার সেই সময় জন্ম হয়নি তারও, এবং এইসব ঘটনা এখনও আমাদের চিন্তাধারাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে। এর ফল আমাদের অনেকে এখনো ভোগ করছে। তার সঙ্গে জড়িত আমাদের দুদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কও।

এর বিপরীত মত যে বাংলাদেশে নেই তা নয়। আছে। আরও বলা দরকার, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় অনেক বাংলাদেশি ভেবেছিলেন যে ভারতের বাঙালিরাও বুঝি তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। তা' না হওয়াতে এদের অনেকে দুঃখিত, এবং এর ফলে আমার মনে হয় অনেকে আবার বাঙালি হিন্দু বিরোধী হয়ে পড়েছেন। ভারতে বাঙালিদের স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং

জাতীয়তাবোধ যে ভারত বিরোধী নয় এবং ভারতের জাতীয়তাবোধেরই একটা অঙ্গ সেটা অনেক বাংলাদেশির কাছে পরিষ্কার নয়। অর্থাৎ এখন পশ্চিমবাংলায় যে সরকার আছে তা কংগ্রেস বিরোধী ঠিকই তবে ভারত-বিরোধী নয়। তবুও যেন অনেক বাংলাদেশিব কাছে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা এই দুই রাজ্যই হচ্ছে এন্‌টি-ইন্‌ডিয়ান বা ভারত-বিরোধী। এছাড়া তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই ১৯৪৭ সালে দুই বাংলা এক হয়ে স্বাধীন হতে পারত, বাংলাদেশিরা ধরে নেন এই এলাকার সঙ্গে যুক্ত থাকত উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তর আসাম-মণিপুর এলাকা। উগ্র বাঙালি-জাতীয়তাবাদে বৃহত্তর আসাম এলাকার লোকেদের খুশি হওয়ার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাইনি।

এবার লেখা উচিত আমাদেব পুজো-পার্বন নিয়ে। সমস্ত ভারতীয়র কাছে, বাঙালিদের কাছে তো বটেই, তাদের দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, সরস্বতীপুজো এবং কালীপুজো 'বাঙালীর পুজো' হিসেবে পরিচিত। এটা হিন্দুদের পুজো না বলে ভারতীয় বাঙালি মুসলমান খ্রিস্টানদের কাছেও বাঙালির পুজো বলেই পরিচিত। বিভিন্ন জাতির ভারতে এটা বাঙালি সত্তা বা আইডেনটিটির একটা রূপ। কিন্তু বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে তা নয়। সেখানে দুর্গাপুজো হিন্দুদের উৎসব বাঙালিদের নয়' কারণ সেখানে তো সবাই বাঙালি --ভাগটা ধর্মীয়। বাংলাদেশে দুর্গাপুজোয় দু-একদিন ছুটি থাকায় এই পুজোর অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেকে অবহিত—এই পর্যন্তই। খুব কম লোকই এসবেব খোঁজখবর রাখেন। দুর্গাপুজোর আগে বরিশালে একটা পুরনো (মাহিলাড়া) মঠ দেখতে যাই। মঠের একপাশে একটা দুর্গামূর্তি তৈরি হচ্ছিল। সঙ্গে আমাদের বন্ধু হোসেনের নয়বছরের মেয়ে ডলিও ছিল। ডলি ওর বাবাকে মূর্তি দেখিয়ে জিজ্ঞসা করে 'আব্বা এটা কি ?' ডলির আব্বার উত্তর দেওয়ার আগে আমার মেয়ে জয়িতা ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। বয়সে ছোট হলেও জয়িতা আমেরিকাতে দুর্গামূর্তি দেখেছে···কিন্তু ডলির সে সুযোগ হয়নি। কলকাতায় বিভিন্ন পুজো, লাইটিং ও ভাসান মিলিয়ে একটা রমরমা ভাব থাকে। অনেকটা যেন ব্রাজিলের বিয়োর কার্ণিভাল, বা প্যারিসের ব্যাস্টিল ডে প্যারেড, বা আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস ফোর্থ-অব-জুলাই বা নভেম্বর মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের থ্যাংক্সগিভিং ডে প্যারেডের মতো। আবার বাংলা-দেশীয় অনেক উৎসব আছে যেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গীয়দের কাছে উৎসবই নয়। বাংলাদেশিরা অনেকে বুঝে পান না আমরা কেন ভাষা শহিদ দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে কোনো হৈ চৈ করি না। আর ঈদ ? সেটাতে আর কজন হিন্দু

অংশগ্রহণ করেন ? আসলে একে অন্যেরটা জানার ইচ্ছাই আমাদের খুব কম, সঙ্গে সঙ্গে দুই দিকে দুই ধর্মীয় লোক হয়ে যাওয়ায় জানার সুযোগও কমে যাচ্ছে। ব্রিজগুলোই আস্তে আস্তে নিজেদের অজান্তেই ভেঙে যাচ্ছে। নতুন ব্রিজ কিছু তৈরি হচ্ছে এবং আরও হবে আশাকরি।

দুদিকের অনেকের মধ্যেই একটা ধারণা আছে যে বাংলাদেশে তারা "বাংলা নিয়ে আরও এগিয়ে গেছে" এবং তারা আরও "বেশি বাঙালি হয়েছেন।"। ঠিকই। কিন্তু আগেই লিখেছি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলায় বাঙালির সংজ্ঞায় তফাৎ অনেক। একদিকে যেমন আমাদের পুরনো ইতিহাস ও সংস্কৃতি হিন্দু, বৌদ্ধ-সহ আঁকড়ে ধরার চেষ্টা আছে তেমনি আছে ইস্‌লামী, আরবী এমনকি উত্তর ভারতীয় উর্দু সংস্কৃতিকে ধরার চেষ্টা। যেমন শুনেছি অধ্যাপক মুতাল্লিবের বাঙালি হিন্দু পালা-পার্বন বাংলাদেশে বাঁচানোর প্রয়োজনীয়তার কথা কারণ তা' নাকি দেশের মাটির থেকে তৈরি হয়েছে, তেমনি এক মৌলবীর কাছে শুনেছি আরব দেশের মহত্ত্বের ও হিন্দু মালাউন সমাজের নীচতার কথা; যদিও মৌলানা একটু দুঃখ প্রকাশ করেই বলেছিলেন "মিশকিনদের আরবীরা খুব একটা শ্রদ্ধা করে না।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ইস্‌মাত আরা কাঁকন এর কাছে যেমন শুনেছি বাঙালি বিবাহিত মহিলাদের শাঁখা পরার সেকুলার ব্যাখ্যা তেমনি দেখেছি যেমন ঢাকার শাঁখারীপাড়ার জীর্ণ অবস্থা, সেইসঙ্গে ভুক্তভোগীর কাছে শুনেছি শাঁখা-সিঁদুর বা ধুতি পরার বিপদ। যেমন শুনেছি একাত্তরের স্বাধীনতায় হিন্দু-মুসলমান বীরত্বের কথা, তেমনি দেখেছি একাত্তরের অনুষ্ঠানে মোনাজাত, সেইসঙ্গেই দেখেছি হিন্দু-খ্রিস্টান শহিদের স্মৃতিতে গীতা ও বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার অনিচ্ছা।

এমন একজন ১৯৭১-এ ক্ষতিগ্রস্ত লোক অমিতবাবু। ঢাকার গ্র্যাজুয়েট, ইন্‌জিনিয়ার। ১৯৭১-এ হিন্দুহত্যার সময় পাকিস্তান মিলিটারির হাতে তার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হন। ১৯৭১-এ উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আসেন ও সেখানে থেকে যান। বাংলাদেশ হলোকস্ট মেমোরিয়াল কমিটি করেন। পরে আমেরিকায় ওই কমিটির কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু অমিতবাবু আমেরিকায়, সেখানে সরাসরি বাংলাদেশি ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব তা তো করবেনই না, উপরন্তু যে সব হিন্দু বাংলাদেশি মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সামাজিকতা করেন তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখেন না। সরকারি ও বেসরকারি কাজে, লেখাপড়ায় বাংলাদেশে বাংলা ব্যবহারে নীতি ও প্রয়োগ, রিয়্যালিটি ও রেটরিক (**Reality rhetric**), অনেক কাছাকাছি। স্কুল কলেজের লেখাপড়া, বক্তৃতা, সরকারি

কাজ সবকিছুই। আমার মতে সেখানেও আরও অনেক দূর যেতে হবে—তারাও যেন ইংরেজদের ছাড়তে দ্বিধাগ্রস্ত। আমাদের পশ্চিমবাংলায় বাংলা ব্যবহারের নীতি ও প্রয়োগে দূরত্ব অনেক বেশি। ১৯৭৯-এর ফেব্রুয়ারিতে পশ্চিমবাংলা সরকারের নিচু ক্লাসে শুধু বাংলায় পড়ানোর নীতিকে অভিনন্দন জানিয়ে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী শম্ভু ঘোষকে চিঠি দিয়েছিলাম। শ্রী ঘোষ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নীতিকে সমর্থন জানানোর জন্য 'ধন্যবাদ' দিয়েছিলেন। তার ছয় বছর পরে ১৯৮৫-এর অগস্টে গিয়েছিলাম রবীন্দ্রসদনে পশ্চিমবাংলা সরকার আয়োজিত সোভিয়েত জিপসীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে। সঙ্গে বেশ কয়েকজন ছিল। আমাদের সংস্কৃতিমন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফাদিকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন শুধু ইংরেজিতে। সঙ্গে না বাংলা, না হিন্দি, না সাঁওতালি, না রাশিয়ান, না রোমান্‌শ (জিপসীদের ভাষা)। আমরাই ভাষান্তর করেছিলাম বাংলায়-পড়া শিশু ও বয়স্কদের (এর প্রতিবাদ করে প্রভাসবাবুকেও চিঠি দিয়েছিলাম)। বাংলাদেশের লোকেদের আমাদের এই দিকটা খুব চোখে পড়ে। পশ্চিমবাংলার বাম সরকারের সমর্থক কুমিল্লার সওকাত আলম রাজু একটু মর্মাহত হয়ে বলেছিলেন 'ইন্‌সাল্লাহ্‌ সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বাংলাদেশিরা যখন কলকাতায় আসেন তখন তাদের কাছে কলকাতাকে জীর্ণ-শীর্ণ, নোংরা, ও 'অবাঙালি' মনে হয়। এছাড়া তাদের কাছে প্রায় সব জায়গায়ই 'হিন্দি এলাকা' বলে মনে হয়। অনেকের কাছে কলকাতা আসাটা একটা 'শক' (shock) এবং দুঃখেরও শুনেছি। টুরিস্ট ও ব্যবসাদাররা যেখানে থাকেন এস্‌প্লানেড বা পার্ক স্ট্রিট এলাকায় সেখানে না পান বাঙালি মুখ, বাংলা সিনেমা-থিয়েটার বা বাংলা সংস্কৃতি। এ নিয়ে অনেকের অভিযোগ। এ ছাড়া বিভিন্ন অফিস, কারখানায়, এয়ারপোর্ট, কাস্টমস্‌-এ অবাঙালি মুখ দেখে আশ্চর্য হয় কেন পশ্চিমবঙ্গীয়রা। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন না যেমন তারা করেছিলেন পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে।

অনেক আগেই লিখেছি যে বাংলাদেশি একাংশের তাদের ব্রিটিশ বিরোধী হিন্দু নেতা কর্মীদের প্রতি একটা সফ্‌ট কর্ণার (soft corner) আছে। অনেকের আছে গভীর শ্রদ্ধা। যার ফল হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন্না হলের নাম পাল্টে রাখা হয়েছে সূর্য সেন হল, আর বরিশালের টাউন হলের নামকরণ অশ্বিনী দত্ত টাউন হল। যদিও আগেই লিখেছি উদ্বাস্তু সম্পর্কে দুদিকের বোঝা-পড়ার তফাৎ অত্যধিক। বাঙাল হিন্দুরা যেভাবে গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছেন

তাতে গ্রামের সঙ্গে মধ্যবিত্তর যোগটাও কমে এসেছে। বাংলাদেশিদের সেটা হয়নি। আমরা আর কজন পুজোয় বাড়ি বা দেশে যাই, যেমন যায় বাংলাদেশিরা ঈদের ছুটিতে! বাড়ি কনসেপ্ট (concept) আমাদের মধ্যে ভেঙে গেছে। পার্টিশনের আগে বাঙালি চাকুরে, ডাক্তার-মাস্টার, গায়ক-নাট্যকার নেতা-দাতা কলকাতা বাদ দিলে তুলনামূলক ভাবে অনেকে আসতেন পূর্ববঙ্গের কয়েকটা জেলার গণ্ডগ্রাম থেকে। তার মধ্যে ছিল ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম। ওই রকম হারে পশ্চিমবাংলার একমাত্র মেদিনীপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকেই এই সব লোক আসতেন। বাংলাদেশি উদ্বাস্তরা স্বাভাবিক-ভাবেই সবাই কলকাতা বা শহরে এসেছেন। গ্রাম সম্পর্কে কলকাতাবাসীর রোমান্স থাকলেও রিয়ালিটির সঙ্গে যোগ কম। ফলে ভারতীয় বাংলা হয়েছে অতিমাত্রায় কলকাতা কেন্দ্রিক, বাংলাদেশ সেইরকম ঢাকা কেন্দ্রিক নয়। বিদেশে ভারতীয় বাঙালি দেখলে সবাই জিজ্ঞাসা করে 'আপনি কলকাতার?' আর বাংলা-দেশিদের জিজ্ঞাসা করে 'আপনি বাংলাদেশের?'—সেখানে ঢাকার সঙ্গে যোগ থাকলেও গ্রামের ভিটেমাটির সঙ্গে যোগটাও আছে সবাইয়ের।

যে কারণেই হোক্ আরও একটা ব্যাপারে দুদেশের লোকের মধ্যে পরস্পরের দেশ সম্পর্কে একটা তফাৎ গড়ে উঠেছে—সেটা হলো 'ভীতি'। পশ্চিমবঙ্গীয়, এমনকি অল্প কিছুদিন আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন তেমন লোকেদেরও বাংলাদেশ সম্পর্কে অহেতুক একটা ভীতি আছে। বিদেশে দেখেছি ভারতীয় বাঙালি যাঁরা বাংলাদেশি লোকেদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও পরিবারগত ভাবে মেলা-মেশা করেন তাঁরাও বাংলাদেশকে সমাজগত ভাবে বেশ ভয় করেন। অন্যদিকে বাংলাদেশিদের সেই রকম কোনো ভীতি নেই। তাদের ভীতিটা কলকাতাকে হিন্দুস্তানিঘেঁষা, নোংরা, অসহ্য, অতিথিবৎসল-কম এইসব কারণে। আমাদের মধ্যে অনেকের, বিশেষত বাঙালদের দেশ ছেড়ে আসার এক্সপিরিয়েন্সটা অনেকের কাছে অপ্রিয় ও খারাপ যদিও দেশ-গ্রামের স্মৃতিটা সবারই খুব মধুর।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলায় এক ব্যাপারে দুদেশের লোকেদের খুব মিল, সেটা হলো তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা। দাঙ্গা রায়ট-এর জন্য আমরা প্রায়ই 'বিহারী'দের দোষ দিই। দুর্ভাগ্যক্রমে এটা আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়তো কোনো কোনো সময় বিহারীরা রায়টে সাহায্য করে। কিন্তু বাংলাদেশ বা পশ্চিমবাংলায় জমি-বাড়ি ভিটে পুকুর কজন বিহারী পেয়েছেন? ১৯৭১-এ বাংলাদেশ হওয়ার পরে সেখানে সংখ্যালঘুদের হঠাৎ করে

উপলব্ধি করেছেন যে দেশে তো আর 'বিহারী' নেই, তবু কেন তাদের ভিটের প্রতি অন্তের একটা অদৃশ্য টান রয়ে গেছে। এখন তারা বুঝেছেন বিহারীরা ছিল আমাদের স্কেপগোট।

রাজনীতিতে দুদেশের একটা জায়গায় মিল আছে। অনেকটা মজার। পশ্চিমবাংলায় রাজনীতি এখন বামঘেঁষা, তাই কাউকে ডিস্‌ক্রেডিট (Discredit) করতে হলে রিঅ্যাকশনারী বললেই চলে। আমেরিকায় কাউকে কমিউনিস্ট ও চীন-রাশিয়ায় ক্যাপিটালিস্ট রোডার বলার মতো। বাংলাদেশে রাজনীতি ধর্মঘেঁষা বলে সেখানে কাউকে ছোট করতে গেলে প্রো-হিন্দু বা হিন্দুঘেঁষা বললেই চলে। কোনো মুসলমান যদি হিন্দু প্রধান এলাকা থেকে নির্বাচিত হন এবং তাকেও হিন্দু-ঘেঁষা বললে রাজনীতিগতভাবে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

আগেই লিখেছি ভারত ও পশ্চিমবাংলা সম্পর্কে বাংলাদেশিরা যত খোঁজখবর রাখেন আমরা তার তুলনায় অনেক কম খোঁজখবর রাখি। পশ্চিমবাংলার অনেক কিছুকেই সেখানের বুদ্ধিজীবীমহল শ্রদ্ধা করেন ও ভালোবাসেন। আমার ধারণা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক কিছুই কলকাতা ও ঢাকার বুদ্ধিজীবীমহলের খোলা-খুলিভাবে আলোচনা করা দরকার। সেটা হবে ফর্‌মালিটির বাইরে এবং গাইডেড টুরের বাইরে। ছিট্‌মহল, সংখ্যালঘু, ফারাক্কা, শত্রু সম্পত্তি আইন, কাঁটাতারের বেড়া, চোরা-ব্যবসা, কয়লা-পাট সব কিছুই। বরিশালের রেভারেন্ড স্টিভেন্স-এর মতো বাংলাদেশি এক স্ট্যাটিসটিক্স অধ্যাপক তাহেরউদ্দিন আমাকে দুঃখের সঙ্গে বললেন 'আপনারা একটু চেষ্টা করুন, না হলে আর ৫০ বছরের মধ্যেই আমাদের সব সংখ্যালঘুই ভারতে চলে যাবেন।' বলেছিলাম 'সে তো আপনাদেরই দেখার কথা। আমাদের কেন?' আমাদের মতো বিশেষ অবস্থার দেশে শুধু সংখ্যালঘুই নয় সব কিছুতেই দুজনদের খোলামনে আলোচনা দরকার। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি অধ্যাপক তাহেরুদ্দিনের ভবিষ্যৎবাণীই ঠিক হয় তবে আমাদের চিন্তা করতে হবে আরও দুকোটি আড়াই কোটি (পঞ্চাশ বছরে বেড়ে এর থেকে বেশিও হতে পারে) মুখকে কি ভাবে আশ্রয় দেব, কি খাওয়াব, পুরনো অধিবাসীদের উন্নতিই বা কি করে করব, ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লেখপঞ্জী

১. অলি আহাদ, 'জাতীয় রাজনীতি; ১৯৪৫-৭৫', বর্ণরূপ মুদ্রায়ন, ঢাকা (তারিখ নেই, ১৯৮৩), পৃ ২৫-২৬।

২. আগে উল্লিখিত, মণিরুজ্জামান, 'দি ফিউচার অব বাংলাদেশ' পৃ ২৬৯।

ওই বাংলা এই বাংলা : উচ্ছ্বাসের অন্যদিক

এই লেখাটা লিখছি কয়েকবার বাংলাদেশে যাওয়া ও দুই বাংলার সামাজিক পরিবর্তনের জানার সুযোগ হওয়ার পর। এছাড়া বিদেশে অনেকবছর বাঙালি-বাংলাদেশি ও ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা, আমেরিকার বঙ্গ সম্মেলন, বাংলাদেশি সম্মেলন, গবেষণামূলক অ্যাকাডেমিক বেঙ্গল স্টাডিজ কনফারেন্সে যোগ দিয়ে তার অভিজ্ঞতা নিয়েও লিখছি। এর সঙ্গে আছে বাঙাল বা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের ফেলে আসা 'দেশ' সম্পর্কে যে ইমেজ বা ছবি সেটাও।

আসলে পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছুর ভালো ও সঠিক ধারণা আছে। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি অন্য অনেক কিছু বিষয়ে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব, বিকৃত এবং সত্যকে এড়িয়ে যা সত্যের অপলাপ। গত ৪০ বছর ধরেই। এই চিন্তাধারা আমার বদ্ধমূল হচ্ছে আমি যত বাংলাদেশে যাচ্ছি, বাংলাদেশ সম্পর্কে যত জানছি, যত পত্র-পত্রিকা পড়েছি, এবং যত লোকেদের সঙ্গে মিশছি। এর সঙ্গে আছে কলকাতায় প্রকাশিত 'আমাদের ফেলে আসা দেশ' ও 'ওই বাংলা'র ওপর লেখা বিভিন্ন বইপত্র। আমার এই লেখাটা ওই 'অন্যদিকটা' নিয়েই। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে আমার জন্ম কলকাতায়। ১৯৪৭ এর আগেই কলকাতার সঙ্গে আমাদের পরিবারের যোগাযোগ ছিল। তবে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সহপাঠী সবার কাছেই ছিলাম 'বাঙাল'। আমার বাবার বাড়ি বরিশাল ও মামাবাড়ি ফরিদপুরে। এবং আমাদের পদবী নাকি বরিশালের আঞ্চলিক। তবে বাবা-মা'র কলকাতায় আসাটা অবশ্যই দেশভাগ। না হলে কিছুটা ন্যাচারাল, স্বাভাবিক মাইগ্রেশন-এ তাঁরা কলকাতায় পাড়াশুনা ও কাজের জন্য আসতেন ঠিকই, তবে তাঁদের গ্রামের সঙ্গেও যোগাযোগ থাকত। যেমন থাকে কলকাতাবাসী পশ্চিমবঙ্গীয়, বিহারী, ওড়িয়া, অসমিয়া, নেপালিদের, এবং ঢাকা-চট্টগ্রামবাসী বাংলাদেশিদের।

আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার ধারণা অনেক মিথ (Myth) অলীক কাহিনী তৈরি করেছি, তার অল্প কয়েকটার কথা লিখছি। আমাদের এই মিথ ও রিয়্যালিটির তফাত অনেক, এবং বাংলাদেশ হওয়ার পর আদান-প্রদান

বাড়লেও ব্যবধানটা থেকেই গেছে। অনেকে বলেন বেড়েছে। কিছু ব্যাপারে ব্যবধানটা আকাশ-পাতাল-এর মতো। আমিও এইসব নিয়েই বড়ো হয়েছি, এবং এখনও আমার পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এইসব মিথ নিয়েই আছেন। যতই জানছি, শুনছি, এবং চাক্ষুষ দেখছি তাতে মনে হয় এই মিথ্‌টা পারপেচুয়েট (perpetuate) করা বা বাঁচিয়ে রাখাটা অন্যায়, দুই দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক,-এর সঙ্গে জড়িত আছে এই উপমহাদেশে বাঙালি ও অন্য লোকেদের সম্পর্ক। এর ফলে ভুগেছেন ও ভুগছেন বিশেষত বাংলাদেশের হিন্দুরা, ও দুদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়; সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই মিথ বাঁচিয়ে রাখাটা প্রায় ক্রিমিনাল। এই অলীক অবস্থার কারণ অনেকটা আমাদের ব্যক্তি অভিজ্ঞতা ও সামাজিক বা গোষ্ঠীগত সম্পর্ককে (communal or group relation) তফাত না করার ক্ষমতা। এর সঙ্গে আছে আমাদের 'ভদ্রলোক'দের ভদ্রতা, অর্থাৎ অপ্রিয় সত্য না বলার চরিত্র।

বাংলাদেশে ভারতবংশোদ্ভূত ও অন্যরাও পশ্চিমবাংলা সম্পর্কে কিছু মিথ তৈরি করেছেন, সেগুলো আমার লেখার বিষয় নয়। রাজনৈতিক দিক দিয়ে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট-বাম, অকমিউনিস্ট বাম সবাই এই মিথ বাঁচিয়ে রেখেছি এবং রাখছি। তবে দেশভাগের (১৯৪৭) আগে কংগ্রেস যেহেতু বাংলাদেশে (পূর্ববঙ্গে) নন্‌সেকুলার হিন্দু পার্টি হিসাবে মুসলমান মধ্যবিত্তদের কাছে পরিচিত ছিল তাদের পক্ষে বৃহত্তর মুসলমান সমাজকে মোকাবিলা করায় রাজনৈতিক দিক দিয়ে মুশকিল ছিল। বামের সে সমস্যা ছিল না – বিশেষ করে কমিউনিস্টদের মুসলীমলিগের দেশভাগকে সমর্থন করায়। বামেরাও এই মিথ মোকাবিলা না করায় দুদেশেরই ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে। ইদানীং বাংলাদেশ ও সেখানকার সমাজব্যবস্থার ওপর কলকাতার কিছু সাংবাদিক উচ্ছ্বাস পেরিয়ে ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস করছেন।[১] তবে তার সংখ্যা কম।

অনেকেই অবগত আছেন যে বাংলাভাগের জন্য (ভারত ভাগ) ও বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের বিরাট অংশই হিন্দু বাঙালিদের—ডান ও বাম দায়ী করেন, তবে আমাদের পশ্চিমবাংলায় মুসলিমলীগ ও মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদকেই দায়ী করে। আমরা সবাই জানি যে ১৯০৫ এর প্রথম বঙ্গভঙ্গের পর থেকে বাংলাদেশে (তখন পশ্চিমবাংলা সহ) হিন্দু-মুসলমান খুনোখুনি বাঙালি রাজনীতির একটা অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। যার পরিণতি ১৯৪৬ এর 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' বা 'কলকাতার বড়ো রায়ট'। পরে নোয়াখালীর গণহত্যায় সরকারি হিসেবে ৭,০০০

লোক মারা যায়। কিন্তু এরপর ১৯৪৭ থেকেই ফি বছর বাংলাদেশে হিন্দুবিরোধী গণহত্যা বা পোগ্রোম[২] চলে, এবং সেজন্য বাংলাদেশে (তখন পূর্ব পাকিস্তান) ও পশ্চিমবাংলাতে কংগ্রেস-বাম একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকেন। পশ্চিমবাংলায় সেই সঙ্গে চলে এই হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাজনীতি ও দলভারী করার খেলা। সেদেশে এই হত্যার প্রতিবাদ আমরা ক'জন বা কোন পার্টি করেছি? মুশকিল হয়েছে অন্য জায়গায়। যেহেতু এ নিয়ে পশ্চিমবাংলায় (ও বাংলাদেশে) আমরা কোনো প্রতিবাদ করিনি, সেহেতু খুব কম বাংলাদেশিই, এমন কি প্রগতি-শীলরাও (progressive) জানে না যে দেশ ভাগের ফলে এবং তারপর সে দেশে কোনো লোকের, বিশেষতঃ সংখ্যালঘুদের, কত অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এই ব্যাপারে আমার এক অধ্যাপক বন্ধু দুঃখ করেই বলেছিলেন, 'জানেন আমার এক লেখায় লিখেছিলাম যে ১৯৪৭-এ দেশভাগের ফলে অনেক লোকের ক্ষতি হয়েছে'। সম্পাদক সাহেব আমাকে লেখাটা ফেরত দিয়ে বললেন 'এ সব কথা লিখবেন না কারণ দেশের খুব অল্প লোকই এ কথা বিশ্বাস করে'। আমি নিজেও অনেককে জিজ্ঞাসা করে একই উত্তর পেয়েছি। এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন কয়েকজন, বিশেষত: শ্রীবদরুদ্দীন উমর, ঢাকার 'নিউ নেশন' পত্রিকার ওয়াহিদুল হক, ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন। এদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করার সুযোগও পেয়েছি। এছাড়া আরও অনেকের সঙ্গে। শ্রীওয়াহিদুল হক আমেরিকার সাইথ এশিয়া ফোরামে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও সংখ্যাগুরুর মানসিকতার ওপর বক্তব্য রাখেন। তবে এঁদের প্রভাব ক্ষমতাসীনদের ওপর খুবই কম।

কলতাতার লোকেদের বাংলাদেশ সম্পর্কে, বিশেষতঃ সংখ্যালঘু হিন্দু ও আত্মীয়-স্বজনদের অপ্রেশনে (oppression—নির্যাতন) নির্বাক থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সবাই প্রায় দুটো কারণ দেখান। এক তো অন্য দেশ বা অন্য রাজ্য সম্পর্কে 'নাক না গলানোর রীতি' এবং এর সঙ্গে অনেকে বলেন 'তাতে হিন্দুদের আরও খারাপ হবে'। তবে দু কোটি লোকের দেশত্যাগ (এখন প্রজন্ম নিয়ে আড়াই কোটি), কয়েক লাখ লোকের সরাসরি মৃত্যু, এরপর রিফিউজি ক্যাম্প, শিয়ালদা স্টেশন, দণ্ডকারণ্য, আন্দামানে রোগ-শোক-ক্ষুধায় মৃত্যুর থেকেও বেশি খারাপ হতো কিনা জানি না। তাছাড়া বাঙালিরা তো কোনোদিনই দেশি বিদেশি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করেনি: সে কাশ্মীর থেকে কেরালা, অমৃতসর থেকে আগরতলা, আমেরিকা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা, বা প্যালেসটাইন থেকে পোল্যাণ্ড। কিন্তু বাংলাদেশ বা নিজের দেশেই এটাই

আমাদের হিন্দুদের সেল্ফ্ সেণ্টারড্নেস (self centeredness) বা আত্মসিদ্ধির ফল না আমাদের নতুন কোনো রেসিজম (Racism) বা বর্ণবাদ ?

অনেক বাংলাদেশি সরাসরিই বলেন সেখানে রায়টিং হয়নি, এবং হলেও সেগুলো হয়তো হিন্দুরাই শুরু করেছেন। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুদের—এমনকি বাংলাদেশের হিন্দুদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা সবাই রায়টিং, টেনশন, ভয় দেখানোর তারিখ, ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বলেন। যা'র ফলে তাঁরা অনেকে দেশ ছাড়তে 'বাধ্য' হয়েছেন। আমাকে আবার অনেক বাংলাদেশি বলেছেন যে তাঁরা জানেন রায়টের সময় অনেকে প্রতিবেশী হিন্দুকে আশ্রয় দিয়েছেন। বা জানেন যে তাঁদের এলাকার কারোর সর্বনাশ হয়েছে, বা জানেন যে কোনো ধর্মীয় স্থান নষ্ট বা অপবিত্র হয়েছে, বা কেউ ধর্মান্তরিত হয়েছেন। তবুও অনেকে বোঝেন না যে অবস্থা 'স্বাভাবিক' হবার পর কেন অনেকে দেশ ছেড়েছেন ! তাঁরাও কারণ খোঁজেন অন্যখানে, যেন এ্যাবস্ট্রাক্ট বা অবাস্তবে : 'ও পাড়ার লীডার' 'বে-পাড়ার গুণ্ডা', 'অমুক পুলিশের বড়া সাহেব' 'বা' 'তমুক ম্যাজিস্ট্রেটের দুলাভাই'। বাংলাদেশে হিন্দুবিরোধী পোগ্রোমটাই সমস্যা নয়। বাংলাদেশে ভুক্তভোগী অনেকের চোখে সমস্যাটা হলো আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা, যার বড়ো একটা অংশ হলো বাংলাদেশজাত বাঙাল। অনেকের প্রশ্ন আমেরিকা, বৃটেন, নর্থ আয়ারল্যাণ্ড প্যালেস্টাইন, দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু বা নিপীড়িত লোকদের জন্য আন্দোলন সমর্থন-লেখা করলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নীরব কেন ? ছাত্রাবস্থায় আমি নিজেও তো এ রকম প্যারেড প্রস্তাবে যোগ দিয়েছি কলকাতায়। এটাই কি বাঙালি হিন্দুদের হিপোক্র্যাসি বা ভণ্ডামি ও ডবল স্ট্যান্ডার্ড -এর জন্যই কি বাংলাদেশি অনেকে বলেন 'হিন্দু মার্কসবাদী' 'হিন্দু সমাজবাদী ?'[৩] এই বিষয়ে মনে পড়ে বরিশালের সুবোধবাবুর কথা—যাঁর সঙ্গে সেখানে ১৯৮২ ও ১৯৮৫তে দেখা হয়। বললেন, 'এই তো ১৯৮৪তে আমার ছোট ছেলে সুজিতকে কলকাতা পাঠিয়ে দিয়েছি। পড়াশুনায় খুব ভালো, এক বছর কলেজে পড়েছে এখানে। এখন পড়ে বারাসতে। মার্কসইজমে খুব ঝোঁক !' যেন বাংলাদেশে মার্কসবাদ ও সমাজবাদের দরকার নেই। আসলে যেটা রামকমল ও সুকসুদবাবুরা জানালেন যে কোনো মাতব্বর সুবোধবাবুর ভিটেটা দখল করেছেন (শত্রু সম্পত্তি আইন !) এবং শাসিয়ে গেছেন যেন কেউ কিছু না বলেন। সুবোধবাবুর ভয় ছিল আপত্তি করলে সুজিতের বিপদ হতে পারে। বাবা ও ছেলে কেউই এই অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি।

আমার এক বাংলাদেশি বন্ধু অধ্যাপক মহঃ কমজলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যদিও বাংলাদেশি হিন্দুরা ভারতে গেছে (বেশির ভাগ) অ্যাজ এ পারসিকিউটেড মাইনরিটি বা নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের মতো, তবে তাদের ক্ষমতাভোগকারী মধ্য-বিত্তদের মানসিকতা ছিল অনেকটা বসতিস্থাপনকারী ঔপনিবেশকদের জন্য, যেখানে তারা নিজেদের শাসন কায়েম করতে পেরেছে। যেমন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার স্প্যানিস ও পর্তুগীজরা, উত্তর আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান ও অস্ট্রেলিয়াতে ইংরেজ ও ফরাসিরা। এমনকি গোড়ার দিকে পাকিস্তানে 'বিহারিরা' (তাই সেখানে নাম মোহাজীর')। 'অর্থে আমাদের নেতা, বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতে বা পশ্চিমবাংলায় তাদের ক্ষমতা পাওয়ার, এবং তা'র এক সহজ উপায় হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে লোকজন এনে ভোটার বাড়ানো। প্রতিবাদ জানালে সেখানে অপ্রেসন কমলে তো লোক আসা কমতেও পারে! এ ব্যাপারে আমরা বাঙালিরা এখনও ডবল স্ট্যাণ্ডার্ড চালিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশে চাকমাদের নির্যাতনের ফলে ত্রিপুরায় ৪০,০০০-এর ওপর চাকমা শরণার্থী অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে আছেন। তাদের ফিরিয়ে দেবার জন্য ত্রিপুরায় মার্কসবাদী সরকার ও কংগ্রেস সরকার অনেক চেষ্টা করেছেন। এটা অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু তাদের ত্রিপুরা বা পশ্চিমবাংলাতে পুনর্বাসন দেওয়া যাচ্ছে না কেন? ত্রিপুরার জনসংখ্যার অধিকাংশই তো বাংলাদেশ থেকে আসত।[৪] ১৯৮৮তেই তো বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে ১২৫,০০০-এর বেশি লোক পশ্চিমবাংলায় এসে থেকে গেছেন এটা শুধু ভিসা নিয়ে আসার হিসেব। চাকমাদের মতো আমরা এই বাঙালিদের ফেরত পাঠাবার চেষ্টা করছি? ত্রিপুরা যদি চাকমা রাজ্য হতো তাহলে কি বাংলা-দেশি চাকমাদের এই অবস্থা হতো? যেহেতু আমরা ক্ষমতায় আসীন থাকতে পেরেছি তাই পেছনে-আর-যারা-পড়ে-আছে তাদের দিকে ফিরে তাকাইনি। অন্যদিকে ক্ষমতা দখল করতে পারছি বলেই যতদিন বাংলাদেশে (পাকিস্তানে) থাকছি ততদিন সংখ্যাগুরু মুসলমান সমাজ আমাদের কাছে টানছে না। এ বিষয়ে বাংলাদেশের অনেকেই আমাদের সুবিধাবাদী বলে দায়ী করেন। নিজেদের 'দেশ' বললেও সেখানকার কজ (couse) ও সংগ্রামে যোগ দিইনি নাকি। যদিও বাংলাদেশে হিন্দুদের লড়াই প্রথমে তাদের বাঁচার লড়াই হয়েছে।

কলকাতায় যখন বড়ো হয়েছি তখন আমাদের আত্মীয়-বন্ধু-পরিচিতদের মধ্য থেকেই শুনতাম অমুক জায়গার রাজা, ১৯৪৯এ এসে এদিকেও রাজকীয় কিছু একটা হলেন। অথবা কোনো পূর্ববঙ্গীয় জেলাশাসক পুলিস সুপার, মন্ত্রী,

এম. এল. এ, প্রিন্সিপ্যাল বিভিন্ন বছরে সেখান ছেড়ে এসে এদিকেও ওইরকম কিছু হলেন। ছোটবেলায় এর জন্ম অনেক গর্বও হতো। এখন অবশ্য বিন্দুমাত্র গর্ব হয় না, বিশেষত যাঁরা বলেন 'সব ঠিক ছিল এমনিই এসেছি'। যাঁরা 'এক কাপড়ে' এসেছেন, বা 'শেষ সম্বলটুকু গা থেকে খুলে দিতে হয়েছে 'বেনাপোল বর্ডারে' বা 'তিনদিন পায়ে হেঁটে আগরতলা সীমান্তে মূর্চ্ছা গেছেন, তাদের কথা অবশ্যই আলাদা। তাদের বাঁচার সংগ্রামকে জানাই শত প্রণাম।

আজকাল আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবী ও ওপিনিয়ন-মেকাররা ওদিকে যাচ্ছেন, এবং অধিকাংশ সময়ে আমাদের সেখানকার রিপোর্টও মিসলিডিং বা বিভ্রান্তিকর। অনেক সময় বাস্তবের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের এক্স-পিরিয়েন্স ভালো হলে আমরা বলি-লিখি সেইরকম। সমাজগত বা গোষ্ঠীগতভাবে স্থায়ী বাসিন্দাদের কি হচ্ছে সে পরিচয় পাওয়া যায় না। ১৯৮৬তে পশ্চিমবাংলার এক সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাজনীতিবিদের বেশ কয়েকযুগ পর তাঁর 'দেশ' ভ্রমণের ওপর এক ধারাবাহিক লেখা বের হয় কলকাতার এক দৈনিক কাগজে।[৫] তিন-চারটে ছবির মধ্যে একটা ছবি ছিল ধুতিপরা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। পাঠকরা ধরেই নিতে পারেন ধুতিপরা সেখানে স্বাভাবিক—এটা বাস্তবের সঙ্গে যে কতদূর অসঙ্গত তা বাংলাদেশি মাত্রেই জানেন, বিশেষত হিন্দুরা। এরপর মনে পড়ে বাংলাদেশের পুরনো ও অতি পরিচিত হিন্দু মঠ দেখার কথা। মঠ আছে ঠিকই কিন্তু উনি দেখার অল্প কিছুদিন আগেই সেটাকে নষ্ট করার চেষ্টা হয়। (পরে ১৯৮৭তে) এই অল্প কিছুদিন আগে বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি সমাজবিজ্ঞানী বাংলা-দেশের সমাজবিজ্ঞান সম্মেলনীতে সম্মানিত হন ও তাঁর জন্মভূমি ঢাকার উয়াড়ী দেখেন। এই ভদ্রলোককেই বিদেশে তাঁর নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশিদের অধিকাংশই আমন্ত্রণ জানাতে অস্বীকার করেন। নিজেদের এই মানসিকতাকে সমালোচনা করে এক ভদ্রলোক লেখেন।

"কিন্তু আপত্তি ওঠে বিভিন্ন যুক্তিতে যেমন, ওঁরা বিদেশি, আমাদের সম্পর্কে কি জানে, আলোচনা আমাদের ভাষায় চলবে সুতরাং বাইরের লোক আনা ঠিক নয় ইত্যাদি। সম্প্রতি…(ওমুককে) নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।…অনুষ্ঠানে 'বাংলা-দেশের স্বাধিকার সংগ্রাম ও অর্থ নৈতিক মুক্তির রূপরেখা' বিষয়ে ভাষণ প্রদানের জন্যে একটি প্রস্তাব এসেছিল।…শৈশব ঢাকায় কেটেছে…। …বাংলা ভাষায়ও তার দখল প্রখর (কিন্তু তাকে বাদ দেওয়া হল…(যেন)…আমাদের কাম্য… অনুরূপ বাংলাদেশি বক্তা।…এ ব্যাপারে আমাদের নতুন করে ভেবে দেখার সময়

এসেছে।...৬" এগুলো সামান্য উদাহরণ মাত্র। আমাদের দুই বাংলার ওপর লেখা নভেলগুলোও এই ধারণা দেয়। কিন্তু আমরা যখন যাই এগুলো আমাদের চোখে পড়ে না কেন? সেটা ভাবা দরকার। আর চোখে পড়লে লেখা উচিত নয়? আমাদের অনেক মন্ত্রী, সাংবাদিক, গাইয়ে, খেলোয়াড়, গবেষক গিয়েও যে চিন্তাধারায় খুব পরিবর্তন হচ্ছে তা নয়। ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে নিপীড়নের বিরুদ্ধে আপত্তি ও প্রতিবাদ হচ্ছে সব সময়েই। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও আছে। সমাজতান্ত্রিক চীনের সরকার, পার্টি, জনগণ থেকে ইন্দোনেশিয়ায় সংখ্যালঘু চীনা হত্যা ও ভিয়েতনামে চীনাদের অপ্রেশনের বিরুদ্ধে বহু প্রতিবাদ গেছে। অনুরূপভাবে সমাজবাদী হাঙ্গেরি থেকে প্রতিবাদ গেছে সমাজবাদী রুমেনিয়ার সংখ্যালঘু হাঙ্গেরিয়ানদের পক্ষে; আলবেনিয়া থেকে যুগোশ্লাভিয়ার সংখ্যালঘু আলবেনিয়াদের পক্ষে; এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন, মঙ্গোলিয়া, চীন ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া থেকে অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।

১৯৭৫ এ পুনর্মুদ্রিত দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'ফেলে আসা গ্রাম'-এ পরিচিতিতে লেখা···'স্বাধীন বাংলাদেশের···এই গ্রন্থখানি পাবার জন্যে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন'।[৭] হয়তো ঠিকই, এবং আমি মনে করি এইরকম দলিল আরও অনেক অনেক লেখা উচিত ছিল। তবে বাংলাদেশের মনে সত্যিই কি সেরকম ছাপ ফেলেছে? সেখানের হিন্দুদের অবস্থা কি ১৯৪৭ থেকে অনেক ভালো? ধামরাই-এর পাশ দিয়ে ক'বার গেলেও সেখানে দাঁড়ানো হয়নি। আমাদের বন্ধু আ. মা. দাউদ বেশ অনেকবার গর্বভরে বলেছে যে তাদের ধামরাই এ 'দেশের সবচেয়ে বড়ো ছয় তলা রথ ছিল। ১৯৭১এ মিলিটারি সেই কাঠের রথগুলোকে পুড়িয়ে দেয়,···এবং এখন একটা ছোট্ট নামমাত্র রথ আছে। এই ধামরাইয়ের কথা পড়ে ও অনেককিছু জানতে পারে, তবে ওর ধারণা গ্রামের সবাই মনে করে, 'হিন্দুরা এমনিই চলে গেছে।'

আমাদের উচ্ছ্বাসের মধ্যে অত্যন্ত অন্যায় ভাবে একটা ব্যাপারে না-বলা থেকে গেছে, সেটা হলো সেদেশের 'শত্রু সম্পত্তি আইন'। এখন সেই পুরনো আইনেরই নতুন নাম 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' (ভেস্‌টেড প্রপারটি অ্যাক্ট) এই আইনের বলে সরকার হিন্দুদের লক্ষ লক্ষ একর জমি, হাজার হাজার বাড়ি, দালান, পুকুর, দোকান, ব্যবসা সরকার, মোড়ল-মাতব্বর, মধ্যবিত্তরা দখল করেছেন। হিন্দুদের সঙ্গে ভুগেছেন ও ভুগছেন সংখ্যালঘু খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, চাকমা। এখন কিছু বিহারী, এবং মাঝেমধ্যে সরকার-বিরোধী দু-একজন মুসলমান ব্যক্তি। সাধারণভাবে মধ্য ও উচ্চবিত্ত

মুসলমানরা এর ফলে লাভবান হলেও তারা সাধারণ ভাবে এ ব্যাপারে নির্বাক। নির্বাক আমরাও। সেদেশে দু-একজন এই আইন, দক্ষিণ আফ্রিকার কালোদের জমি বাড়ি নেওয়ার আইন, ইস্রায়েলে প্যালেস্টনিয়দের জমি বাড়ি নেওয়ার আইন, ও আগের জার্মানিতে ইহুদিদের সম্পত্তি নেওয়ার সঙ্গে তুলনা করেন। বিনা বাধায়, বিনা ক্ষতিপূরণে, মুহূর্তের মধ্যে লোকে পথে বসেছেন। তাই আমাদের ভাবা দরকার উচ্ছ্বাসের বশে 'দেশ' সম্পর্কে অন্ধ হওয়া ভাল না খারাপ?

এরপর দুইদেশের মধ্যে যোগাযোগ ও সামাজিকতা নিয়ে লিখতে হয়। বিশেষত বাংলাদেশি মুসলমান ও পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দু—দুই সংখ্যাগুরুর মধ্যে। বাংলাদেশি যাঁরা কলকাতায় আসেন এবং তখন আমরা তাদের দেখি টুরিস্টদের মতো, অল্পসময়ের জন্য। ঠিক সমানে সমান হয় না। অল্পদিনের জন্য অন্যদিকে গেলে আমাদের কনট্রাডিকসান বা পরস্পর বিরোধিতা বা আইডেনটিটির পুরো দিক প্রকাশ পায় না। সেইজন্য আমি বিদেশের অভিজ্ঞতাটা লিখছি।

যখন দেশি লোক অল্পসংখ্যায় থাকেন তখন দুইদেশের লোকেদের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। শুধু বাঙালি বাঙালিই নয়, বাঙালি-মালয়লি, তেলুগু-সিন্ধি, চাকমা-রাজস্থানী, হিন্দু-মুসলমান। তখন যোগাযোগ হয় পরিবারগত ভাবেই। লোক বাড়তে থাকলে তখন ভাগাভাগিটা প্রায় দৃষ্টিকটুভাবে দেশ-গত বা ধর্মগত ভাবে হয়। বড়ো বড়ো শহরে যেমন নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, টরেনটো, মন্ট্রিল-এ, এখন অবশ্য একাধিক বাঙালি সংঘ আছে, তার অন্তত একটা বাংলাদেশি, অন্যটা ভারতীয় বা 'বেঙ্গলি'। ওপর দিয়ে দেখতে গেলে এটাতে চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে একটাতে কোনো হিন্দু নাম নেই, অন্যটাতে নেই মুসলমান নাম (এক-আধটা ব্যতিরেক থাকতে পারে)। 'বেঙ্গলি'র অর্থে যেন বাংলাদেশিদের আর বোঝাচ্ছে না। নিজেদের মধ্যে বোঝা-পড়ার ইচ্ছেটাও যেন কমে যাচ্ছে। এর পরিণতি এমন হয়েছে যে এক আধবার একই বাড়ি ভাড়া করে একই দিনে দুটো নববর্ষ অনুষ্ঠান হচ্ছে; একটা সকালে, অন্যটা বিকেলে। একটা মুসলমানদের (বাংলাদেশি), অন্যটা হিন্দুদের (পশ্চিম-বঙ্গীয়)। এর মধ্যে দু-একজন থাকেন যাঁদের দুটোতেই যেতে হয়। দুদিকের সম্মিলিত প্রয়াসে এমনকি রবীন্দ্র, নজরুল, একুশেও উদ্‌যাপন করা সম্ভব নয়। আরও বলা দরকার গত আট বছর ধরে উত্তর আমেরিকায় বঙ্গ সম্মেলন হচ্ছে। উদ্দেশ্য সমস্ত বাঙালিদের নিয়েই উৎসব করা—সেমিনার, বক্তৃতা, নাচ, গান। কিন্তু এখানেও বাধা গোড়া থেকেই। তার পরিণতি গত ১৯৮৭ থেকে 'বাংলাদেশি

সম্মেলন'। এতে ভারতীয় কারুরই আপত্তি নেই। একটা ক্ষুদ্র সংখ্যক লোক চেয়েছিলেন বঙ্গ সম্মেলনেই বাংলাদেশ, পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরার এলাকাভিত্তিক যা' যা' আলোচনার প্রয়োজন সেগুলো করা। কিন্তু তাঁদের চিন্তা বেশিদুর এগোয়নি। আপত্তি এসেছে দুদিক থেকেই। যেহেতু বঙ্গ সম্মেলনে প্রায় সবাই ভারতীয় তাই এই সম্মেলনে যে দু-একজন বাংলাদেশি তাদের নাম দিয়ে সমর্থন দেন তাঁদেরকে অনেক বাংলাদেশিই ভালো চোখে দেখেন না, অনেকের বদনাম হয় 'প্রো-হিন্দু'। সংকীর্ণতা বাড়তে থাকলে 'বঙ্গ' কথাতেও আপত্তি করেন, কারণ সেটা নাকি শুধু পশ্চিমবঙ্গকে বোঝায়, ইত্যাদি। অনেকের আপত্তি হয় আসলাম আলায়কুম সম্বোধনে, অন্যদের আপত্তি নমস্কারে। 'সোনার বাংলা' আগে হবে না 'জনগণমন' আগে হবে সেটাও বড়ো হয়ে দাঁড়ায়। এক বাংলাদেশি কবি ও গ্রামীণ অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ[৮] বাংলাদেশের ওয়াশিংটনে এক বড়ো সরকারি প্রতিনিধি থাকার সময় তিনি নিজে 'উত্তর আমেরিকা বঙ্গ সম্মেলনে' উপস্থিত থেকেছেন ব্যক্তিগত ভাবে। কিন্তু এতে অনেক বাংলাদেশি অখুশি হয়েছেন। অন্য সময়ে অবশ্য বাংলাদেশের সরকারি প্রতিনিধি আসেননি, এসেছে ভারতের। এই প্রসঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতার কথা বলা দরকার। পশ্চিমবাংলা থেকে আজকাল যাঁরা বিদেশে আসছেন তাঁরা সাধারণত নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজবাদী অথবা মার্কসবাদী বলেন, ও অনেকে সেইরকম পার্টি করতেন। (বাংলাদেশিদেরও একটা বড়ো অংশই তাই, তবে সেখানে অনেকে ইস্‌লামপন্থীও বলেন)। কিন্তু খুবই দুঃখজনক যে তাঁরা প্রায় সবাই বিদেশে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে অক্ষম বা অপারগ। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের তিক্ততার এটা অন্যদিক। এর থেকে দুদিকেই সমাজগতভাবে তিক্ততা বাড়ে। বাংলাদেশিদের কতটা 'দোষ বা গুণ' তা এখানে আলোচ্য নয় ; আমাদের ব্যর্থতা নিয়েই লিখছি এবং দেশের বুদ্ধিজীবীদের ভেবে দেখা দরকার কেন এটা হচ্ছে এবং কেন আমরা বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় করাতে পারছি না। ১৯৮৮র নিউ জার্সিতে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সম্মেলনে কলকাতার এক নামকরা লোক (পরে জেনেছি বাঙাল) বাংলাভাষার অবস্থার কথা বলতে গিয়ে কলকাতা, পশ্চিমবাংলা ভারত, দিল্লি, আমেরিকা সব জায়গার কথা উল্লেখ করলেও বাংলাদেশের কথা বলেন না। এতে এক জনপ্রিয় বাংলাদেশি আমাদের মানসিকতার আপত্তি জানালে সব পশ্চিমবঙ্গীয়ের খুবই শ্রুতিকটু লাগে।[৯] শ্রুতিকটু লাগলেও ভেবে দেখা দরকার পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে উচ্ছ্বাস ও অজ্ঞতা থাকছে কেন ?

১৯৮৭তে অনুষ্ঠিত (ওয়াশিংটন ডি. সি.) প্রথম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলনে ওই দুই বাঙালিকে নিয়ে অনুষ্ঠান-করায় ক্ষুদ্র 'প্রো-হিন্দু' গ্রুপ আশা করেছিলেন যে অন্তত সেমিনারে ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের কাউকে আমন্ত্রণ জানাবেন। তা হয়নি। সেমিনার-অনুষ্ঠানে আমেরিকান, পাকিস্তানি, তুরস্কীয় থাকলেও পশ্চিমবাংলার একজনও ছিলেন না। 'হিন্দুনামধারী' ছিলেন ৮-১০ জন, পশ্চিমবঙ্গীয় দুজন সহ। এক হিন্দু ভদ্রলোক দুঃখ করে বললেন 'বাংলাদেশের এক নেতা (অর্থে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সিভিল সার্ভিস) আমাকে দেখে বললেন, 'এখানে অনেক হিন্দু এসেছে দেখছি'।' এটা খারাপ অর্থে না বললেও খুব শ্রুতিকটু লেগেছিল। ৪০০-৫০০ জন লোকে ৮-১০ জন অর্থাৎ ২% বা ৩% এর মতো, এবং বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা (১২%) ধরলে হওয়া উচিত ছিল অন্তত ৪০-৫০ জন। যেহেতু বাংলাদেশের শাসকবর্গে—সিভিল, মিলিটারি, জেলা শাসক, পুলিশ, মন্ত্রী ও দূতাবাস, ইউনাইটেড নেশন ও তার ডেলিগেট—একেবারে হিন্দু ও সংখ্যালঘু বর্জিত (বাংলাদেশের এক সমাজ বিজ্ঞানীর কথায় 'বাংলাদেশি এপারথায়েড') সে দেশের শাসকবর্গের চোখে এই সামান্য সংখ্যাও আনুপাতিক হারে বেশি মনে হয়। নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বাংলাদেশ সম্মেলনেও তথৈবচ। বঙ্গ সম্মেলনও বাংলাদেশি বা মুসলমানদের তেমন টানতে পারছে না।

শিশুদের একসঙ্গে পাঠশালাতে পড়ানোর কথাও লেখা দরকার। প্রথমেই বলা দরকার যে খুব অল্পসংখ্যক বাঙালিই উভয় দেশের—তাদের ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখান। বেশির ভাগ পরিবার তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলেন। অনেক মা-বাবা তাও করেন না। কয়টি পরিবার তাদের ছেলেমেয়েদের বাংলা লিখতে-পড়তে শেখান সেটা বলা মুশকিল, তবে একশ পরিবারে যদি পাঁচটি পরিবার লিখতে-পড়তে শেখান তবে বাঙালিরা ধন্য মনে করতে পারেন। এদিকে দু-একটা জায়গায় উইক-এণ্ড-এর দেড়-দু ঘণ্টার পাঠশালা আছে। তাতে পাঁচশটি পরিবারে একটি পরিবারও যোগ দেন না। নিউ ইয়র্ক এলাকায় চালু আছে দুটো পাঠশালা। এই পড়ানোর অনিচ্ছার সঙ্গে আছে আমাদের প্রগতিশীলদেরও না-জানা-কমিউনালিজম—যেটা আমরা ঢাকা-কলকাতা বসে বুঝব না। প্রথম ঝামেলায় আছে পাঠ্য বই। এই বইতে সামান্য সামান্য অঞ্চল বা সমাজগত শব্দ থাকলে একে অন্যেরটা গ্রহণ করে না। দুএকটা উদাহরণ দিচ্ছি, শ্রুতিকটু লাগলেও লিখছি। বইতে যদি 'আমি জল খাব' থাকে তাতে বাংলাদেশিরা (মুসলমান)

খুব আপত্তি করেন। এগুলো শেখার চেয়ে অনেকের কাছে তাদের পুত্রকন্যা বাংলায় অশিক্ষিত থাকাও ভালো মনে করেন। ঠিক তেমনিই 'আমি পানি খাব' থাকলে পশ্চিমবঙ্গীরা (হিন্দু) ঠিক তাই মনে করেন। এই প্রসঙ্গে অন্য এক পাঠশালা শুরু ও ভেঙে যাওয়ার কথা মনে পড়ে। এটা শুরু করেছিলেন দুই বাংলার লোক মিলে। আমাদের এক বান্ধবীর কথায়, 'একদিন গিয়ে দেখি এক শিক্ষিকা (মুসলমান) তার (হিন্দু) ছাত্রকে পড়াচ্ছে 'খালু বাজারে গেছে, অথচ খালুর প্রতিশব্দ ছাত্রটিকে বলতে অনিচ্ছুক। অন্যদিকে এক শিক্ষক (হিন্দু) তার (মুসলমান) ছাত্রীকে পড়াচ্ছে 'কণা সকালের জলখাবার খেয়ে ইস্কুল গেছে'। এবং জলখাবারের বদলে নাস্তা কিছুতেই বলবেন না, কেননা সেটা নাকি বাংলা নয়।' তবে একথা বলা দরকার যে আমাদের গত দু'শ বছরের বাংলা লেখার সৌজন্যে বাঙালি মুসলমানরা যত সহজে 'হিন্দু' কথা (জল, মাসি, কাকা, জামাইবাবু, পিসে) নিতে পারেন, আমাদের লিবারাল হিন্দুরা তত সহজে 'মুসলমানী' বাংলা (নাস্তা, পানি ফুফু, আব্বা) নিতে পারেন না। ইংরিজি বেশি পছন্দ করি (ব্রেকফাস্ট, ড্রিংক, আন্টি)।

অনেক বাংলাদেশি মুসলমান পরিবারের এর সঙ্গে আপত্তি থাকে। পাঠশালায় যদি কেউ সরস্বতী পুজোতে যুক্ত থাকেন। পাঠশালায় সরাসরি সরস্বতী পুজো না হলেও প্রায় সব হিন্দুই চান পাঠশালার সবাই মিলে একদিন সরস্বতী পুজা করুক। আমার চোখে এটা একটা পুজোর থেকে পার্টিই বেশি মনে হয়, কারণ পুজো হয় লোকের সুবিধা মতো। হিন্দুশাস্ত্রের দিনক্ষণে নয়। শ্রীপঞ্চমী হয়তোবা হয় একাদশীর রাতে, আর কালীপূজা পূর্ণিমাতে। যাই হোক, বেশির ভাগ বাংলাদেশি মুসলমানেব এতে আপত্তি থাকে। আপত্তি যে ধর্মীয় তা নয় (খ্রিস্ট-মাস করতে আপত্তি নেই!), আপত্তি হিন্দুদের উৎসবে। তাদের কাছে এটা বাঙালিদের উৎসব নয়, হিন্দুদের উৎসব। অনেকে তাদের ছেলেমেয়েদের বিচিত্রানুষ্ঠানে যোগ দেওয়াতেও আপত্তি করেন। সে ধার্মিক, অধার্মিক, ডান, বাম যা-ই হোন। ঈদের অনুষ্ঠানের অবস্থা একই।

আমরা যদি রিয়্যালটি বা বাস্তবকে এড়িয়ে চলি তাহলে আমাদের দুদেশের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝি ও তিক্ততা বাড়বে। এছাড়া দুদেশের মধ্যে যে তিক্ততা তৈরি হচ্ছে তাতে আমাদের মধ্যবিত্তদের সত্য এড়িয়ে চলার প্রবণতা অনেকাংশে দায়ী। পশ্চিমবাংলার অবনতি ও নিজেদের ব্যর্থতার কারণ হিসেবে সত্য ও কাল্পনিক—দিল্লি বরাবরই আমাদের স্কেপগোট (**Scapegoat**)। প্রাক্-

স্বাধীনতা আমল থেকেই আমরা দিল্লির সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছি। বাংলাদেশেও এর প্রভাব অত্যন্ত। সেখানে দিল্লি তাদের স্কেপগোট হলেও সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন সেখানের সংখ্যালঘুরা। দিল্লিকে হাতের কাছে না পাওয়া গেলেও কিছু সংখ্যালঘু হত্যা, ঘরছাড়া, বা মন্দির-গির্জা-বিহার এর ওপর বদলা নেওয়া যায়। আর পশ্চিমবাংলার লোকেদের নীরবতা তাদেরকে উৎসাহ দেয়। মৌনং সম্মতি লক্ষণং। এর ওপরে পশ্চিমবাংলায় বাংলাদেশি (বাঙাল) উদ্বাস্তু সমস্যার জন্য সবসময়েই দিল্লিকে 'দোষী' করেছি। বাংলাদেশ-ও (পাকিস্তান) তাই। কলকাতার মধ্যবিত্ত কতবার খুলনা-ঢাকা-চট্টগ্রাম, অনেকের 'দেশ', এর শাসককুলকে 'দোষী' লিখেছি? এটাই কি আমাদের নতুন ধরনের ডিস্‌ক্রিমিনেশন (Discrimination)? এই ব্যাপারে ১৯৮৮-র বন্যা ও ফরাক্কার কথা সর্বজনবিদিত। বন্যার জন্য তারা ভারতকে সর্বতোভাবে দায়ী করেন—এমনকি ভারত নাকি অতি বৃষ্টি তৈরি করেছে; ভারত নাকি নেপাল-ভুটান-তিব্বতের গাছ কেটে ফেলেছে বাংলাদেশকে ক্ষতি করার জন্য; নাকি কৃত্রিম উপায়ে হিমালয়ের বরফ গলিয়েছে অনেক (গোপন) বাঁধ থেকে (গোপনভাবে) বেশি জল ছেড়েছে; আরও অনেক। এছাড়া ফরাক্কার জল নাকি রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশে নেওয়া হচ্ছে। কিছুদিন আগে নভেম্বরে (১৯৮৮) বাংলাদেশ প্রোগ্রেসিভ ফোরামের পত্রিকায় এক অধ্যাপক লিখেছেন, যে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ফরাক্কার দরকার 'কলকাতাকে মনোরম সাজে সাজাবার জন্য', এর প্রধান কারণ ছিল 'মূলতঃ ভারতের উত্তর-প্রদেশের মরুভূমিসম বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে উর্বর করা।'[১০] উজানে সিলেট, ময়মনসিং রংপুর, দিনাজপুর সবারই জল বাড়িয়েছে ফরাক্কা। এ তো গেল একটা দিক। অন্য দিকে খরা মরসুমে প্রচার চলে ফরাক্কার জন্য নাকি "উত্তরবাংলা মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে।" এখন সেদেশে অনেকেই বিশ্বাস করেন দিনাজপুর থেকে সিলেট, খুলনা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সবজায়গাতেই খরা-বন্যা দুটোই হচ্ছে ফরাক্কার জন্য। এর সঙ্গে একটা মিথ তৈরি হয়েছে যে পশ্চিমবাংলার নেতারা নাকি বলছেন পশ্চিম বাংলার সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো সমস্যা নেই, আছে—বাংলাদেশের মতোই—দিল্লির সঙ্গে। এর ওপর দৃষ্টিপাত করতে গিয়ে সবাই মন্ত্রীদের তাঁদের 'দেশ' ভ্রমণ ও সাংবাদিক সম্মেলনের কথা বলেন। তাঁরা নাকি সেখানে বলেন "ফরাক্কা সম্পর্কে পশ্চিমবাংলার কোনো দাবি নেই।"[১১] আমাদের মতো দেশে যেখানে শতকরা ৭৫ ভাগ নিরক্ষর, ও সেখানে আমরা ইমোশন বা আবেগের দ্বারা চালিত হই। সেখানে মুখের কথা ও মিথ দারুণ ভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে। অনেকের ধারণা

আমরা বাঙালরা সেদেশের সুবিধাগুলো ভারতে দেখব, ভারতের সুবিধার বদলে। ঠিক তেমনিই আমাদের বাংলাদেশি উদ্বাস্তু সমস্যার জন্য আমরা দিল্লিকে দোষারোপ করার জন্য সেদেশেরও অনেকের ধারণা এটা দিল্লির দোষ এবং দিল্লিকৃত এবং প্রায় কোনো বাংলাদেশিই এই দু-আড়াই কোটি লোক (বংশোদ্ভূত নিয়ে)-এর জন্য সামান্যতম সামাজিক, রাজনৈতিক. অর্থনৈতিক, মানসিক, নৈতিক গ্লানি বোধ করে না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। আছে বলেই বাঁচোয়া। আমি মনে করি এই মানসিকতার জন্য আমরাও প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। ১৯৮৮তে বাকৃনেল (Buck nell) ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত ২৩তম বেঙ্গল স্টাডিজ কনফারেন্সে এই ভারত-বাংলা সমস্যা নিয়ে আলোচনার সময় 'বাংলাদেশের সব সমস্যার জন্য ভারতকে দায়ী করার প্রবণতায়' ; একজন প্রশ্ন করেছিলেন 'ভারতে দুকোটি বাংলাদেশি লোকদের ব্যাপারে বাংলাদেশ কি কিছু করছে ?' উত্তরটা পাওয়া যাবে প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর অসমিয়া ও ত্রিপুরী "বাংলাদেশি বহিষ্কার আন্দোলনের" পরিপ্রেক্ষিতে। বলেছিলেন "ভারতে কোনো বাংলাদেশি নেই।" এর সঙ্গে আমরা ভদ্রলোকেরা যেটা বলি না সেটা হলো 'তারা তো হিন্দু বা বৌদ্ধ'। তাদের বক্তব্য, এই উদ্বাস্তুরা স্বেচ্ছায় গেছেন, উদ্বাস্তু নয় বসতি স্থাপনকারী. যেমন অনেকে এসেছেন আমেরিকায় তাই এদের জন্য কোনো অবলিগেশন (Obligation) নেই। পশ্চিমবাংলা পুলিশের হিসাব মতে প্রায় ১,২৫,০০ বাংলাদেশি এই অল্প কিছুদিনের মধ্যে ভিসা-পাসপোর্ট করে কলকাতায় থেকে গেছেন। আমি নিজেই জানি বরিশাল, মাহিলাড়া, নারায়ণগঞ্জের কয়েক পরিবার ১৯৮২ থেকে ৮৫-এর মধ্যে দেশ ছেড়েছেন। তাদের কথায় 'চাপে পড়ে।' আমি আর ক'জনকেই বা চিনি। এরা একেবারে নিঃশব্দে 'রাতের অন্ধকারে' চোদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়েছেন। ইদানীং যে সব বাংলাদেশি সংখ্যালঘু বিদেশে আসছেন তারা বাংলাদেশ ও তাদের সংখ্যালঘু বন্ধু-পড়শীদের অত্যন্ত ভালবাসলেও রাজনৈতিক সমাজ সম্পর্কে অত্যধিক বীতশ্রদ্ধ ও তিক্ত বললে ভুল বলা হবে না।

ছিটমহল ও তিনবিঘা নিয়েও একটু বলা দরকার। বাংলাদেশে এটার ইমোশনাল অ্যাপিল খুব বড়ো হয়েছে। এখানেও সবার ধারণা বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার বাম (ও বাঙাল ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ডান ও বাঙাল) সরকার একমত, এবং দিল্লিরই (কংগ্রেস ও না বাঙাল) বাধ সাধছে জমি দিতে। ইস্যুটা এখন জমি হস্তান্তরে নেই। এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বাংলাদেশের জমি যেন ভারত সরকার দখল করেছে! এটা যে ভারতেরই জমি, এবং সেদেশের সুবিধার

জন্য তাদের দেওয়ার কথা হচ্ছে সেটা অনেকেই জানেন না। এবং পশ্চিমবাংলারও অনেকের যে এতে আপত্তি থাকতে পারে তা একেবারেই অবগত নন। এছাড়া বাংলাদেশের খুব কম লোকই (মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী) জানেন যে ভারতেরও অনেকগুলো (অন্তত পাঁচটা, যার এলাকা বাংলাদেশের ছিটমহলের অনেক বেশি) ছিটমহল বাংলাদেশের মধ্যে আছে। বাংলাদেশ সারভেয়র জেনারেলের ম্যাপে বাংলাদেশের একটা ছিটমহল পশ্চিমবাংলায় দেখানো আছে, ভারতের কোনো ছিটমহলই বাংলাদেশে দেখানো নেই। অন্যদিকে ভারতে প্রকাশিত ম্যাপে পশ্চিমবাংলার ও বাংলাদেশের সব ছিটমহলগুলোই দেখানো আছে। এই অবস্থার জন্য আমরাও অনেকাংশে দায়ী, যেহেতু আমাদের শাসকগোষ্ঠী গত ৪৪ বছর ধরেই পশ্চিমবাংলার ছিটমহলের যাতায়াতের অসুবিধার কথা একবারও তুলে ধরেননি (কলকাতাবাসীর কাছে সবচেয়ে প্রত্যন্ত গ্রাম), তাই অন্যদিকেও যে সুবিধা-অসুবিধা আছে সেটা ঢাকার লোকেরা একেবারেই অবহিত নন। ঢাকার এক পদস্থ ভদ্রলোক নিজেই বললেন 'ভারতেরও যে ছিটমহল বাংলাদেশে আছে তা তো কোনোদিন শুনিনি !' অথচ জমি হস্তান্তর না করেই, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দুদেশের আর্থিক সুবিধার জন্য বাংলাদেশ সরকার ইচ্ছে করলেই, সেখানকার নদী-বন্দর ব্যবহার করে ত্রিপুরার বিচ্ছিন্নতা দূর করতে পারে। বন্দরের কর ও মালামাল পার করে ঢাকা সরকারেরও আয় হবে। উত্তর পূর্ব ভারতের সুবিধা হবে। ওই বাকনেল (Bucknell) বেঙ্গল স্টাডিজ কনফারেন্সে এক আলোচনা সভায় এরকম এক চিন্তাধারা প্রকাশ করেছিলেন এক বক্তা। কিন্তু অনেকেই বুঝে পাননি ত্রিপুরা বা ভারতকে কেন তারা সাহায্য করবেন। গঙ্গার মোহনার চর তালপট্টী বা নিউ মুর দ্বীপ অনেকের কাছে এমন মনে হয়েছে যেন একটা নতুন বাংলাদেশের সমতুল এলাকা জেগে উঠেছে। পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবীরা যেহেতু এ নিয়ে মাথা ঘামান না, সেখানের অনেকের বক্তব্য "পশ্চিমবাংলা তো এটা চায় না, সুতরাং ভারতের কেন মাথাব্যাথা ?"

বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর মানসিকতার সঙ্গে আছেন সেখানকার বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তের একটা অংশ। সঙ্গে পরোক্ষভাবে আমরা। এর জন্য কোনো এক রাষ্ট্রপতি, জেনারেল, দল প্রধান, মৌলানাকে দোষ দিয়ে লাভ হবে না। তবে যেহেতু এসব লোকের প্রচুর ক্ষমতা সেহেতু প্রয়োজনে অবশ্যই দোষারোপ করতে হবে—যেটা আমরা সাধারণত করি না। আজ থেকে প্রায় সাত-আট বছর আগে ঢাকার এক উচ্চপদস্থা মহিলা আলাপ করার সময় সাবধান করে দিয়ে বলেন

"দেশে আমাদের সংখ্যালঘুরা এবং দেশের বাইরে ভারতীয়রা হয়েছে নাৎসী জার্মানির ইহুদীদের মতো। দেশের ব্যর্থতার জন্য তারাই দায়ী। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি। খরা ও বন্যায়। ১৯৮৮ তাঁর ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা প্রমাণ করল। এক সাংবাদিক আমাকে মনে করিয়ে দেন, "দেখুন বাংলাদেশি অনেকে বলেন ভারত আমাদের গ্রাস করছে। সত্যি কথা কি আমার মনে হয় তার উল্টোটাই ঠিক। বাংলাদেশের দুই-আড়াই কোটি লোক যে ভাবে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে বসতি স্থাপন করছে, তাতে আমাদেরই এক্সপানশন (expansion) হয়েছে, এবং হচ্ছে। আমরাই হয়েছি এক্সপানশিনিস্ট (expansionist)। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ইউরোপিয়ান বসতির মতো।" বলাই বাহুল্য, যে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে যেন আবার মুসলমান বিরোধিতায় জড়িয়ে না পড়ি। বাঙালি-অবাঙালি-হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান, বাম-ডান, ভারতীয় বাংলাদেশি, বাঙাল-ঘটি সবাইকে নিয়েই বলা দরকার।

এই রকম বিরাট আকারে পপুলেশন মাইগ্রেশন (Population migration) এর ফলে সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা মুশকিল। তবে আজ থেকে অল্প কিছুদিন আগেও কেউ ভাবতে পেরেছিল ভারতে খালিস্তানী, গোর্খা, ত্রিপুরী, অসম আন্দোলন পুরনো রাজনৈতিক কাঠামোকে অল্প কদিনের মধ্যেই ভেঙে দিয়ে যাবে? বা পাকিস্তানে ভারত থেকে আসা প্রথমে—সুবিধাভোগকারী বিহারীরা (মোহাজীর) তাদের সুবিধা রক্ষার জন্য আবার আন্দোলনে নামবে? বর্মা-শ্রীলঙ্কাকেও দেখেছি সংখ্যালঘুদের নতুন করে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা। উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ আমেরিকাতে ৩০০ বছর পরেও "পুরোনো" ও "নতুন" অধিবাসীদের সঙ্গে সংঘাত এখনও মেটেনি—এক ভাষায় কথা বললেও বা একই ধর্মালম্বী হলেও। সমাজবাদী রাষ্ট্রেও দেখছি বহু বহিরাগত এনেও পুরনো-নতুন সংঘাত মেটেনি: যেমন চীনের অন্তঃ মঙ্গোলিয়াতে (মাত্র১৪% মঙ্গোল এখন) তিব্বতে (৫০ এর মতো তিব্বতী); সোভিয়েত ইউনিয়নের এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান; যুগোস্লোভিয়াতে; রুমানিয়াতে।

পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবীদের ভদ্রতা, মিথ, ও মানসিক উচ্ছ্বাসের ওপরে গিয়ে ঢাকার শাসককুল, (বুরোক্রেসি), ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সরাসরি আলাপ আলোচনা করা দরকার, প্রয়োজনে কনফ্রন্ট করা দরকার। নির্যাতনের বিরুদ্ধেও বলা দরকার। ১৯৮৬তে আমাদের দুদেশের ওপরে কয়েকটা লেখা লিখেছিলাম।

১৯৮৭তে কলকাতার একটা ছোট পত্রিকা ছাপে, ও পরে ১৯৮৬তে উত্তর আমেরিকা বঙ্গ সম্মেলনের সময় আমেরিকার 'সংবাদ বিচিত্রা' সেটার পুনঃপ্রকাশ করে। পরে বাংলাদেশ সম্মেলনের সময়ও এগুলো অনেকের হাতে যায়। পড়ে অবশ্যই অনেকে 'প্রো-হিন্দু' বা 'প্রো মুসলিম' বলে গাল দেয়। তবে অধিকাংশ লোকই যারা বিদেশে দুদেশের লোকদের সমান সমান ভাবে চেনাজানার সুযোগ পেয়েছেন, এবং তাদের মনকে যে ভাবে নাড়া দিয়েছে তা দেখে ভালো লেগেছে। এক অর্থনীতিবিদ ও জার্নালিস্ট বললেন "দুদেশের মধ্যে আলাপ আলোচনার ব্যাপারে বোধহয় আমাদের একটা ট্যাবু শুচিবায়ু রোগ আছে। হয় আমরা বিপদের ভয়ে, বাস্তবের ভয়ে অসট্রিচের মতো বালিতে মুখ লুকাচ্ছি, অথবা রাজনীতির নামে একটা মরীচিকার পেছনে ছুটছি।"

উল্লেখ পঞ্জি

১. আনন্দবাজারে (ডিসেম্বর) সুনীত ঘোষ ; আজকাল-এ বাহারউদ্দিন (ছোট ভাই বড়ো ভাই) এর লেখা (১৯৮৮) ইত্যাদি।

২. POGROM) 'পোগ্রোম' কথাটা ১৮-১৯ শতকে জার (রাশিয়া) সরকার-উৎসাহিত সংখ্যালঘু ইহুদী গণহত্যাকে বলা হতো।

৩. মঃ গুলাম কবীর, "মাইনরিটি পলিটিক্স ইন বাংলাদেশ" বিকাশ, নিউ দিল্লি, ১৯৮০।

৪. আনন্দবাজার, নভেম্বর ১৯৮৮, "সওয়া লক্ষ বাংলাদেশি ভিসা নিয়ে এসেও ফিরে যান নি". 'সংবাদ বিচিত্রা,' নিউইয়র্ক ডিসেম্বর ৪, ১৯৮৮ পৃ ৭ এ উদ্ধৃত।

৫. শ্রী পান্নালাল দাসগুপ্ত-র লেখা আজকাল-এ, মার্চ থেকে জুন, ১৯৮৬।

৬. হার্ভাড ও স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ অর্মত্য সেন এর ওপর লেখা বস্টনের আব্দুল মোনেম-এর চিঠি। প্রবাসী, নিউইয়র্ক, ফেব্রুয়ারি ১, ১৯৮৯, পৃ ৩।

৭. দক্ষিণারঞ্জন বসু। 'ফেলে আসা গ্রাম' জিজ্ঞাসা কলকাতা, ১৩৮২ পৃ ৭।

৮. ওবাইদুল্লাহ খান, ১৯৮৪-৮৭, ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত।

৯. লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও বাংলাদের সম্পাদক ওয়াহিদুল হক।

১০. নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত (নভেঃ ২০, ১৯৮৮) বাংলাদেশ প্রোগ্রোসিভ ফোরাম পত্রিকা-য় আতিকুর রহমান সালু। "ভাসানীর লং মার্চ : ফারাক্কা, সাম্প্রতিক বন্যা ও বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক, পৃ ১৫।"

১১. বিশেষত সবাই উল্লেখ করেন আমাদের মন্ত্রীমশাইদের, ও অন্যান্য লোকে-দের, তাদের "দেশ" দেখা ও তাদের বিবৃতি।

আমরা উদ্বাস্তু না ঔপনিবেশিক ?

প্রশ্নটা শুনে অদ্ভুত লাগবে জেনেও লিখছি। এটা লিখছি আমাদের মতো পূর্ব-বঙ্গীয় বা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বাঙালদের উদ্দেশ্যে। তাঁরা যে ভারতে এসেছেন সেই ঘটনা নিয়েই লিখছি। আমার চোখে, বাংলাদেশি ও অন্যান্য কয়েকটি জন-সমষ্টির চোখে, আমাদের নিজেদের মধ্যে যে পরস্পর বিরোধী অন্তর্দ্বন্দ্ব বা কনট্রাডিক্‌শন আছে তারই কয়েকটা দিক নিয়ে লিখছি।

উদ্বাস্তু বা রিফিউজি কথার অর্থ, মানুষ যারা, রাজনৈতিক কারণে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেছেন বা যেতে বাধ্য হয়েছেন। চলন্তিকার ব্যাখ্যা অনুযায়ী "বাস্তুভিটা হইতে দূরীভূত"; আর ওয়েবস্‌টার (Webster) অভিধান অনুযায়ী "ওয়ান হু ফ্লিস টু এ ফরেন কান্ট্রি অব পাওয়ার টু এস্‌কেপ ডেন্‌জার অব পার-সিকিউশন।" অন্য দিকে ঔপনিবেশক বা কলোনাইজেশন কথার অর্থ, যারা অন্যের জায়গায় স্বেচ্ছায় (অনেক সময় অন্যের বাধা সত্ত্বেও) বসতি স্থাপন করেছে। চলন্তিকার কথায় "বিদেশস্থ আবাসভূমি"। আর ওয়েবস্‌টার এর মতে "টু সেণ্ড ইল্‌লিগ্যাল অর রেগুলারলি কোয়ালিফায়েড ভোটারস্‌ ইনটু এন এরিয়া," অথবা "টু ইনফিলট্রেট উইথ ইউস্যুয়ালি সাবভারসিভ মিলিটেন্টস্‌ ফর প্রোপাগাণ্ডা এণ্ড স্ট্র্যাটেজিক রিজনস টু মেক অর এসটাবলিশ এ কলোনী"। যদিও আমরা বাঙালির এ নিয়ে বেশি চিন্তা করিনি তবুও আমার ধারণা আমরা নিজেদের উদ্বাস্তুই ভেবেছি, কলোনাইজর নয়। রিফিউজি কথাটার মধ্যে একটু ন্যক্কার ভাব থাকার জন্য আমরা বাঙাল, পূর্ববঙ্গীয়, ঢাকাইয়া, ময়মনসিংহী, সিলেটি বা এখন বাংলাদেশি বলতেই পছন্দ করেছি। ভারতে অসম, ত্রিপুরী, গোর্খাল্যাণ্ড, কামতাপুরী স্লোগানের মুখে অনেকে নতুন করে আমাদের কথা ভাবছেন, অনেকের কাছে আমরা বসতকারী ঔপনিবেশক। বংলাদেশের বুদ্ধিজীবী শাসনকর্তাদের একটা অংশও তাই ভাবেন। ডান-বাম মধ্য মিলিয়ে কেন এমন চিন্তাধারা হলো, বিশেষ করে বাংলাদেশে, সেটাই আমার প্রশ্ন। এর জন্য কি আমরাও দায়ী? উদ্বাস্তু ও ঔপনিবেশকের মাঝে একটা গ্রুপ আছে সেটা মাইগ্রেণ্ট সেট্‌লার (migrant settler), বা বসতি-স্থাপনকারী। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আস্তে আস্তে বসতি স্থাপন করা। এতে পুরোনো বাসিন্দাদের সমাজ-সংস্কৃতিতে নতুনরা মিশে যেতে পারলে

ঔপনিবেশিকতার প্রশ্ন ওঠে না। অর্থাৎ কটকের লোকেরা যদি মেদিনীপুরে, অথবা পাটনার লোক বংশপরম্পরায় কলকাতায় এসে বসবাস করলে স্থানীয় "মেদিনী পুরিয়া" বা "কোলকেতিয়া" হয়ে যান। কিন্তু "প্রাণের ভয়ে" যদি মেদিনীপুর বা কলকাতায় আসেন তখন তাঁরাই হবেন রিফিউজি—উদ্বাস্তু।

যদিও দেশভাগের আগেই আমাদের পরিবারের অনেকের কলকাতায় জন্ম, এবং আমি নিজেকে বরাবরই কলকেতিয়া মনে করেছি, তবুও ছোটবেলা থেকেই শুনেছি আমাদের পরিবার নাকি বাঙাল, উদ্বাস্তু, ইত্যাদি; এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজন নাকি বরিশাইল্যা, ফরিদপুইর‍্যা, ঢাকাইয়া। অর্থাৎ যদিও পরিবারের অনেকেই পড়াশুনা, কাজ-কর্মের জন্য কলকাতা-ঢাকা থাকতেন দেশ ভাগ না হলে সেই গ্রামের বাড়ির সঙ্গেই যোগ থাকত। বাড়ি বা দেশ বলতে সেটাই। পুজো-পার্বন, বিয়ে-শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, স্কুল ছুটিতে সে দিকেই সবাই পা বড়াতেন।

ঔপনিবেশক বা কলোনাইজেশন বলতেও অন্তত দু'রকম অবস্থা বোঝায়। এক তো হলো শোষণকারী অবস্থা যা ছিলো ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের, আর মালির সঙ্গে ফ্রান্সের। আর অন্যরকম হলো বসতি স্থাপনকারী, যেমন হয়েছে ইংরেজ ও ফরাসিদের সঙ্গে উত্তর আমেরিকার অবস্থা, এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে স্পেন ও পর্তুগালের সম্পর্ক। পরেরটায় নবাগতরা বেশি জোরদার হন ও পুরনো সমাজ ও অর্থনীতিকে বদলে দিয়ে নিজেদের মতো করে সমাজব্যবস্থা সাজিয়ে নেয়। সাধারণত পুরোনো মাতৃভূমির মতো করে। আমাদের কি এটার সঙ্গে কোনো মিল আছে? পূর্ববঙ্গীয়দের ভারতে আসা এবং ত্রিপুরা ও পশ্চিম-বাংলাতে আশ্রয়ের সঙ্গে মেক্সিকোতে স্প্যানীয় এক্সপ্লোরার (explorer) কোরতেজ (cortez) এর আসার সঙ্গে তুলনা করা যায়। এবং আমেরিকায় ইউরোপের ধর্মীয়ভাবে নিপীড়িত ও পলাতক লোকেদের প্লিমাথ (plymath) রকে পৌঁছানো ও আমেরিকার আদিবাসীদের (রেড ইণ্ডিয়ান) থেকে আশ্রয় ও অভ্যর্থনার সঙ্গে তুলনীয়। কোরতেজ যখন মেক্সিকো পৌঁছায় তখন মেক্সিকোর রাজা মণ্টেজুমা (Montezuma) তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। এর কিছুদিন পর কোরতেজ আরও স্প্যানীয় ও (মেক্সিকোর) এজটেক সৈন্য এনে মণ্টেজুমাকে পরাজিত করে। অবশেষে পুরো মেক্সিকো স্প্যানীয় ভাষা ও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। উদ্বাস্তুরা অন্যদিকে ভিতরে ভিতরে পুরনো সমাজ ও আচারের প্রতি টান রেখেও বাইরে নতুন সমাজের সঙ্গে মিশে যায়। অনেকটা ভারতের পার্সিরা, ফ্রান্সের ইহুদি, লেবাননের আর্মেনীয়, কুয়েত জর্ডনের প্যালেস্টিনিয়।

অসম আন্দোলনের অনেকেই বাঙালদের কলোনিয়ালিস্ট বলেছেন। অমিয় দাস তাঁর "আসামস্ এগনি : এ সোশিও-ইকনমিক এণ্ড পলিটিক্যাল অ্যানালিসিস' বইতে সরাসরিই এ কথা বলেছেন, "কলোনাইজেশন অব আসাম বাই নন-ইণ্ডিয়ানস্" (পৃ ৩১-৫৪)।[১] অধ্যাপক বি. এল. আব্বি সম্পাদিত ',নর্থ ইস্ট রিজিয়ন : প্রবলেমস্ এণ্ড প্রস্‌পেক্টস্ অব ডেভেলপমেন্ট" এ মহেশ্বর নিওগ-এর লেখা "আসাম এজিটেটস এগেইনষ্ট ফরেন ন্যাশন্যালস্" (পৃ ২৭৫-২৮৬), ও দেবপ্রসাদ বড়ুয়া লিখিত "সায়লেন্ট সিভিলিয়ান ইনভেসনস ইণ্ডিয়ানস্ ডেনজার ইন্ দি নর্থ ইস্ট' প্রবন্ধে ওই এক মতই ব্যক্ত হয়েছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশের অনেকের ধারণা সেখানে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার, অনাচার হয়নি, যা হয়েছে তা অতি সামান্য, এবং হিন্দু বৌদ্ধরা দেশ ছেড়েছেন স্বেচ্ছায়, অকারণে। এই ব্যাপারে আমাদের ট্যাবু (Taboo), শুচিবায়ু মতো কুসংস্কার থাকায় আমরা মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবিরা "দোষ" খুঁজি অন্যদিকে। এ ব্যাপারে অধ্যাপক তালুকমণিরুজ্জামানের লেখা উল্লেখ্য। 'গ্রুপ ইন্টারেষ্ট এণ্ড পলিটিক্যাল চেঞ্জ' এ লিখেছেন উঁচুবর্ণের হিন্দুর অন্য সবাইকে ম্যানিপুলেট করার কথা, ক্ষমতা দখলের জন্য। অন্য এক লেখায়, 'দি ফিউচার অব বাংলাদেশ' এ লিখেছেন যে বাংলাদেশে মুসলমানেরা হিন্দুদের বিশ্বাস করে না।[২] মনে হয় কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্যি। এবং চিন্তা করা দরকার আমাদের উঁচুবর্ণের মধ্য-বিত্ত, মন্ত্রী থেকে কেরানী, মাস্টার থেকে বিজ্ঞানী এর জন্য দায়ী কতটা। এবং আমাদের সমাজবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার উপশম কি ভাবে করা যায় সেটাও ভাবা দরকার। এখানে নয়, ওখানেও—"দেশে।" এই একই রকমের চিন্তাধারার ওপর আলোকপাত করেছেন অনেকেই, তার মধ্যে রাজ-নীতিবিদ—অলি আহাদ ও গবেষক মুহম্মদ গোলাম কবীরের কথা উল্লেখনীয়।[৩] এবং অনেকের ধারণা বাংলাদেশি (পূর্ববঙ্গীয়) হিন্দু নেতা, উচ্চপদস্থ লোক, সরকারি কর্মচারী, পুলিশ, জার্নালিস্ট, মাস্টাররা—ইচ্ছাতেই কোটি কোটি লোক দেশ ছেড়েছেন।

সাধারণভাবে পৃথিবীর নানান জায়গায় উদ্বাস্তদের দেখলে তাদের বাস্তুভিটা ও মাতৃভূমির প্রতি মানসিকতা অনুযায়ী দুই বা তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক তো হলো উদ্বাস্তরা বংশপরম্পরায় তাদের পুরোনো দেশকে যেনতেনপ্রকারেণ, প্রয়োজনে সেখানকার সরকারকে উচ্ছেদ করেও ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করেন। এর উদাহরণ অনেক আছে—আর্মেনীয়, কিউবা, সালভাদোর, তাতার, কামপুচিয়া,

ভিয়েতনাম, সুদান, এমনকি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী তিব্বতী বা চাকমারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসি ইহুদী, পোলিস রাশিয়ানরা। এমনকি শুনতে খারাপ লাগলেও পাকিস্তানি মোহাজীর (বিহারী) বা জামাতেরা মাঝেমধ্যে হুংকার দেন যে "দিল্লীর লাল কেল্লায় পতাকা ওড়াবেন"—সেটাতেও তারা একটা কথা বলেন যে, "সে দেশটাও আমাদের, আর পাঁচজনের মতো আমরাও তার সমান দাবিদার।" আমরা অবশ্য এই দলে পড়ি না। ইদানীং ইহুদি, প্যালেস্টাইন ও দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা তো আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন।

অন্য একটা মানসিকতা আছে উদ্বাস্তরা ভাবেই না যে পুরোনো মাতৃভূমির প্রতি তাদের কোনো দাবি আছে। সেটাকে তারা তাদের "দেশ" আর বলেন না। এবং সেখানে তাদের কোনোদিন নাড়ীর যোগ ছিল তা'ও প্রায় স্বীকার করেন না। এবং পারলে তাদের পুরোনো দেশের সবকিছু বয়কট করেন বা "দেশ" থেকে যত দূরে থাকা যায় তার চেষ্টা করেন। এর নমুনা কম। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ও ইহুদি গণহত্যার পর জার্মান, পোল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়াকে ইহুদিদের বর্জন, বা জার্মানিকে পোলিস, শ্লাভদের বর্জন। এর সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আর্মেনীয়দের গণহত্যার পর আর্মেনীয়দের তুরস্ক বর্জন তুলনীয়। আর্মেনীয়রা এই গণহত্যার ৭০ বছর পরেও তুরস্কের ওপর চাপ দিয়ে যাচ্ছে এই পাপ স্বীকার করার জন্য। ইহুদিরাও ৫০ বছর পরে পূর্ব জার্মানির ওপর চাপ দিয়ে যাচ্ছেন এই পাপ স্বীকার করার জন্য। আরব দেশ থেকে ইহুদি তাড়ানোর পর আরবভাষী ইহুদিদেরও তাদের পুরোনো দেশ সম্পর্কে সেই মনোভাব। প্যালেস্টাইনের উদ্বাস্তদের, জর্ডনের পুরো নাগরিকত্ব সত্ত্বেও, ইজরায়েল সম্পর্কে মতামত আমাদের জানা আছে। ভারত-পাকিস্তানের পাঞ্জাবী উদ্বাস্তু, ও ভারতে সিন্ধিদের অনেকটা এই রকম মানসিকতা আছে। এছাড়া পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পশ্চিমে যে সব উদ্বাস্তু এসেছেন তাঁরা অনেকে এই গ্রুপে পড়েন। এর সঙ্গে এদের আরেকটা মানসিকতা দেখা যায়। দেশে যে সরকার আছে নতুন উদ্বাস্তরা তার বিপরীত মতাদর্শের দিকে যান। আমাদের ভাষায় অনেকটা রিএ্যাকশনবশত বা প্রতিক্রিয়াবশত। দেশে বাম থাকলে উদ্বাস্তরা হয় ডান (কিউবা, রাশিয়া পোল্যাণ্ড) আর দেশে ডান সরকার থাকলে উদ্বাস্তরা হয়ে যান বামে (চিলে (chile) সালভাদোর) আমরা কি এদিকে পড়ি? এর মধ্যেও একটা সততা খুঁজে পাওয়া যায়; যে দুঃখে ঘর ছেড়েছেন সেটাকে ভুলে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন এবং তাদের রিএ্যাকশনটাও নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই আসে।

তৃতীয় একটা গ্র্রুপ আছে যারা কিছুই করে না। করতে পারে না কারণ তারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী। যেমন বাংলাদেশের গারো, মণিপুরী, সাঁওতালি ও আমেরিকা, ব্রাজিল, ক্যানাডার আদিবাসীরা। সোভিয়েত ইউনিয়নের তাতার (তারা অবশ্য এখন পুরনো বাসভূমিতে ফেরার দাবিই জানাচ্ছে প্রায় ৫০ বছর পরে), বা ইরানের বাহাই সম্প্রদায় (এরাও অবশ্য ইরানে বাহাইদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করার জন্য নিয়মিত বিদেশে ইরানী দূতাবাস, জাতিসংঘতে মিছিল ধর্না, প্রতিবাদ জানিয়ে চাপ সৃষ্টি করেন)। কিন্তু বাংলাদেশি (পাকিস্তানি), হিন্দু উদ্বাস্তদের ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। দেশভাগের সময় হিন্দুরা সেখানে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছিলেন, এবং সেখানের সরকারি কর্মচারী, সচিব, পুলিশ এক কথায় সিভিল পুলিশ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর বড়ো ভাগই তাদের হাতে ছিল। এছাড়া ছিলেন কোটি কোটি গরিব ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সিংহভাগ। এ দিক থেকে দেখলে (পূর্ববঙ্গীয়) বাংলাদেশি হিন্দু উদ্বাস্তরা প্রায় পৃথিবীর ইতিহাসে নজির-বিহীন। যে রকম তাড়াতাড়ি আমরা প্রায় বিনা প্রতিবাদে ধ্বংস হয়েছি ও দেশ ছেড়েছি তা'দেখে মনে হয় বাঙাল হিন্দুরা বোধ হয় সত্যিই মেরুদণ্ডবিহীন। বিশেষত শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, উঁচুবর্ণের হিন্দুরা। বাংলাদেশে যে ফি বছর হিন্দু গণহত্যা, পোগ্রোম হয়েছে আমরা তো তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদই করিনি, উপরন্তু একটা মিথ্যা প্রচার করেছি যে "দেশ ও দেশে সংখ্যা-গুরু—লঘু সম্পর্ক খুব ভালো ছিলো"। সম্পর্ক 'ভালো থাকার' কথায় মাদারীপুরের এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, "সম্পর্ক যদি এতই ভালো ছিল তো বাবুরা দেশ ছাড়লেন কেন"? এ প্রশ্ন বেশ কয়েকজনের কাছে শুনেছি। তিনি আরও বলেন "ওনাদের যেন এদিকে পাঠিয়ে দিই"। রাজনীতিবিদ হলে বলতেন উত্তর-পূর্ব ভারতের নেতাদের মতো হয়তো 'বহিষ্কার' করার কথা। আর এক সিন্ধি মহিলা ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "তোমরা (বাঙালিরা) যত ক্রিটিসাইজ করো না কেন তোমরা (উদ্বাস্তরা) অনেক লাকি যে তোমাদের পক্ষে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও বল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন। তাই ভারতে একটু পা দেওয়ার জায়গা আছে। নাহলে আমাদের মতো পুরো ছন্নছাড়া হয়ে যেতে। দেশভাগের পর আমরা একজন থেকেছি কানপুরে, অন্যভাই বোম্বেতে, এক বোন সুরাতে, অন্য একজন বাঙ্গালোরে। এক জেনারেশনেই আমাদের সিন্ধি আত্মপরিচয় আছে শুধু লাস্ট নেম"। বললাম "সে রকম কোনোদিন ভাবিনি"। তবে পশ্চিমবাংলা না থাকলে বা পশ্চিমবাংলা যদি তামিল, মারাঠি বা হিন্দি ভাষী হতো তা হলে আমাদের

অবস্থা কি হতো ভাবলেও শংকিত হতে হয়। ঢাকার এক অধ্যাপক বললেন "ওদিকে যদি হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদ হতো তাহলে এদিকেও যাঁরা হিন্দু নির্যাতন ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছেন তাঁদেরও হাত শক্ত হতো। একটা নীতিবিহীন অবস্থার মধ্যে চলে আসত না"।

"ওদিকে যারা গেছে তারা তো তাদের এদিকের পরিবার, বন্ধুকে বল দেওয়ার চেয়ে তাদের কি ভাবে এনে কলোনী গড়া যায় (গান্ধী, বাঘাযতীন, বিদ্যাসাগর উপনিবেশ!) তা ভেবেছেন!"

যেখানে পোগ্রোম হয়েছে প্রায় প্রত্যেক বছর; ১৯৪৮, ১৯৪৯, ৫০, ৫২, ৫৪ ...থেকে ১৯৬৪ এর নাটকীয় "হজরতবাল রায়ট। তার পর ১৯৭১ এবং ১৯৭৪ থেকে আবার। সেখানে বা এখানে নেই কোনো স্মৃতিসৌধ বা মেমোরিয়াল। দুদিকেই সংখ্যালঘু সমস্যা অনেকের কাছে মিথ বা মিথ্যা হয়ে গেছে। বাংলাদেশি অনেকেই এ ব্যাপারে অবহিত নন, এবং অনেকে রায়ট বা রায়ট-জনিত সমস্যাকে একেবারে অবিশ্বাস করেন। এটা অনেকটা জাপানের ইতিহাসের বইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি বর্বরতার উল্লেখ না থাকার মতো (এই ইতিহাসের বই নতুন করে লেখার জন্য আজও চীন-কোরিয়া জাপানকে চাপ দিচ্ছে)। আমার এক বন্ধু দুঃখ করেই বলেছিলেন, "জানেন এক বাংলাদেশির সঙ্গে আলাপের সময় বলেছিলাম যে আমরা বগুড়া থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আসি। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলেন "রিফিউজি কোথায়, এমনিই গেছেন! সেটা আর কি? আমার খালাতো ভাইয়ের বন্ধুর নানাও হুগলি থেকে এসেছে শুনেছি"। ভদ্রলোক দুঃখ করেই জানান, "এটা রাতের অন্ধকারে বাড়ি ছাড়ার ব্যথা আরও বাড়িয়েছে। আড়াই-লাখ ও আড়াই কোটি লোকের (যদিও দুটোই খারাপ) ভিটেছাড়ায় যে একটা গুণগত পার্থক্য আছে সেটা অনেকে বুঝতে চান না দেখছি"।

অনেক বাংলাদেশির চিন্তাধারায় (এখন হয়তো উত্তর পূর্ব ভারতেও) হিন্দু বাঙালরা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় আসা আইরিশ, ইটালিয়ান, ইংরেজ, স্কটিশ স্প্যানিয়, জার্মানের সমকক্ষ— ভারতীয় মুসলমানের পাকিস্তানে যাওয়ার মতোও নয়। পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্তের (একাংশের) সাফল্য ও কলকাতার জমি-বাড়ি দেখে-শুনে তাদের ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। বস্তিবাসীদের সাধারণত লোকেদের চোখে পড়ে না। অর্থাৎ আমরা বসতকারী উপনিবেশক। শোষণকারী হয়তো নই।

এরা ইউনিকলি (uniquely) বাঙালি। এবং বাঙাল হিন্দুর বিশেষত্ব। পশ্চিমবাংলার ডান-বাম, সোসালিস্ট-রিঅ্যাকশনারী দুজনারই এটা পারপেচুয়েট

(perpetuate) বা চালু রাখছে। বাংলাদেশের এক সহানুভূতিশীল লোকের কথায় "আমাদের অনেকের যে প্রোটো-ফ্যাসিস্ট চিন্তাধারা হয়েছে তারজন্য আপনাদের বুদ্ধিজীবীরা দায়ী।" এটা অনেকটা "ব্লেমিং দি ভিক্‌টিম" এর মতো। যে ক্ষতিগ্রস্ত তাকেই দোষ দেওয়ার মতো। বাংলাদেশ 'নিউ নেশন' পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রীওয়াহিদুল হকের কথায়[৪] "কেন যে পাশের বাড়ির হিন্দুরা ঘর ছেড়ে যায় তা প্রতিবেশী কেন ভাবে না? কি শোকে যায়?" এই মানসিকতার জন্য আমরাও দায়ী? শ্রীমণিরুজ্জামানের কথায়[৫] "পূর্ব বাংলার হিন্দুনেতাদের তাদের নিজেদের অবস্থা গোছানোর জন্য হিন্দুদের ম্যানিপুলেশন" করার জন্য দায়ী? বা অনেকে বলেন হিন্দু বাঙাল মধ্যবিত্তের মুসলমান বিরোধী রেসিজম্ এর জন্য দায়ী? অর্থে আমরা মুখে উদারতা দেখালেও আদতে দেশ ছেড়েছি সেখানে মুসলমান সমাজে সমানভাবে থাকতে চাইনি তাই। এখানে তো তাদের পাশাপাশি ক্ষমতা ভাগ করতে হচ্ছে না তাই উদারতার কথা বলতে পারি। বাঙাল হিন্দু নেতারা যে ভাবে তাদের সমর্থকদের পরিত্যাগ করেছে সে নজির কি আছে? যে সব নেতা সেখানে থেকে গিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন (খোকা রায়, ত্রৈলোক্য মহারাজ, মণি সিং, রমেন সেন, সুখেন্দু দস্তিদার, ধীরেন দত্ত ও ও আরও অনেক) তাঁরাও অনেক ম্লান হয়ে গেছেন।

আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের (সাধারণত উঁচুবর্ণের হিন্দু) ব্যর্থতা ও সুবিধাবাদীতা বাদ দিলেও আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ কয়েকটা অলীক ও অবাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করেছে। নিজেদের অজান্তেই অনেক প্রেযুডিস ঢুকে গেছে সেটা আমরা বুঝতেও পারি না। ব্যক্তিগতভাবে এটাকে অনেকে পার হলেও সমাজ-গত বা গোষ্ঠীগত ভাবে পারিনি। আমরা নিজেরাই জানি যে অনেকে নিজের পাড়ায় দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য প্রাণ দিতে চাইলেও, অন্য পাড়ায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছি। এ ঘটনা পাঞ্জাব, আসাম, ঢাকা, কলকাতা থেকে এবারে সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্মেনীয় ও আজারীদের মধ্যেও হয়েছে। চলন্তিকা অভিধানের সর্ব-সংস্করণের "জল" এর দেড়পাতার ব্যাখ্যায় "পানি" একবারও বলা নেই, আছে "অপ্, অম্বু, অন্তঃ, উদক……"। এটা কোনো অসদুদ্দেশে করা হয়নি অবশ্যই। নুরুন্নাহার বৌদির কথা মনে পড়ে। তাঁর স্বামী অ. বসুকে বরিশালের সবাই চেনেন—জেলখাটা, মেধাবী, বামপন্থী হিসাবে। বসুদার দাদা বর্ধমানের নামকরা বামপন্থী কর্মী, সেখানে তাঁরা আসেন ১৯৫০ দশকের মাঝে। ওদের বিয়ে সকলে মেনে নেন নি। সেটা অন্য কথা। বৌদির কথাতেই "আমার সবচেয়ে যেটা খারাপ

লেগেছে যে ১৯৭১-এ যুদ্ধের সময় রিফিউজি ক্যাম্প থেকে যখন দেখা করতে যাই। আমার কলেজে-পড়া ভাসুরপোরাও বলে "কাকীমা তোমাকে তো মুসলমান মনে হয় না"। "আসলে আমার হওয়া উচিত ছিল অন্য কিছু? রাঁধুনী না চাষী?"

ময়মনসিংহের এক হিন্দু ভদ্রলোকের কথায় "দেখুন পার্টিশনের পরে আমরা সবাই (হিন্দু) সেখানে ছিলাম। আমাদের করপোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন হিন্দু। তিনি একজন বড়ো নেতা বলে পরিচিত ছিলেন। এছাড়া আরও কয়েকজন নেতা ছিলেন। ৫১-৫২ সালে একদিন হঠাৎ শুনলাম নেতা চলে গেছেন। পরে পরেই মন্ত্রী হলেন। তখনই বুঝলাম আমরা কত দুর্বল। তার কিছুদিন পরে এক ভয়াবহ দাঙ্গার পরে উনি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এসে তার পিসির পরিবারকে নিয়ে গেলেন। এ তো খুব মহৎ কথা, কিন্তু আমাদের অবস্থা কি হলো? উনি যদি প্রতিবাদ জানিয়ে যেতেন তা'ও হয়তো ভালো হতো। অল্পদিন পরে আমরা যাদের নিয়ে থাকতাম, বহু গরিব হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হলেন। এরই কদিন পরে ব্রিজের ওপর ট্রেন থামিয়ে গণহত্যা হলো, এবং জেঠা প্রাণ হারালেন।" "এর অল্প ক'দিন পরেই রাতের অন্ধকারে ওখানের সবাই প্রায় আগরতলা রওয়ানা হলো।" ভাবা যায় যে আরাফাত, রেগিন, ম্যানডেলা, মার্টিন লুথার কিং কিংবা হো চি-মিন শুধু তার পিসিকে গ্রাম থেকে নিয়ে চলে যাবেন? অথবা কাস্ত্রো, দ্য গল বা জর্জ ওয়াশিংটন? আমাকে অনেকে বলেছেন "ফ্যাসিজমের মুখে অনেককেই অনেক কিছু কম্প্রোমাইজ (Compromise) করতে হয়েছে"। তাহলে ফ্যাসিজিমের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার দরকার ছিল। শুধু ভারতে নয়, সেখানেও দেশে। করিনি কারণ আমরা থাকিনি উদ্বাস্তু হয়ে, থেকেছি শাসনকর্তা হিসেবে। শাসন-ক্ষমতা বজায় রেখেছি ও ভোগ করেছি।

১৯৮৫তে বরিশালের স্বরূপ নগর গ্রামের অতি গরিব চাষী ঘরামী ও কুলু পরিবারের কথায় "বাবুরা তো একবারও দেখলেন না আমরা বেঁচে আছি না মরে গেছি"। ১৯৪৭ এর আগে এই কুলুবাবুরাই আমাদের "পশ্চিমবাংলার" নেতাদের অন্ধবিশ্বাসে ভোট দিতেন ; আর বাবুদের জন্য ছিল অন্ধবিশ্বাস ! আর বংলাদেশের এক হিন্দু অনাথের কথায় "আমার আত্মীয়েরা কলকাতায় ভালো আছে শুনেছি, তবে আমার কোনো খোঁজখবর করে না"।

উল্লেখপঞ্জী

১. অমিয় দাস, আসামস এগনি : এ সোশিও ইকনমিক এণ্ড পলিটিকাল এ্যানালিশিস, ল্যানসারস, নতুন দিল্লি ১৯৮২।

২. পূর্বে উল্লিখিত, তা, মণিরুজ্জামান (১৯৮২), নতুন দিল্লি ও দি স্টেটস অব সাউথ এশিয়া, লণ্ডন, ১৯৯২।

৩. পূর্বে উল্লিখিত, অলি আহাদ।

৪. ওয়াহিদুল হক্ এর নিউ ইয়র্ক সাউথ এশিয়া ফোরাম এ বক্তৃতা "অতিক্রান্ত সংকটের প্রত্যাবর্তন" অগস্ট ২৬, ১৯৮৮ ও সাইথ এশিয়া ফোরাম নিউজ-লেটারে প্রকাশিত, হেমন্ত ১৯৮৮, পৃ. ৩।

৫. পূর্বে উল্লিখিত তা. মণিরুজ্জামান।

দেখতে দেখতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ২০ বছর হয়ে গেল। আর ভারতের স্বাধীনতা ৪৪ বছর। এই তারিখগুলো আমাদের 'বিশেষ দিন' হিসেবে মনে রাখা দরকার। শুধু এই দুটো বিশেষ দিন বাংলা ও বাঙালির এখনকার ইতিহাসে নেই। আছে আরও অনেক বিশেষ বিশেষ দিনই ভালো ও খারাপ। যখন আমরা আমাদের সুদিনগুলো উদ্‌যাপন করি তখন আমাদের এই উদ্‌যাপনের তাৎপর্য এবং সঙ্গে যে কত লোকের কষ্টস্বীকার ও আত্মত্যাগ আছে সে কথাও মনে রাখা দরকার।

আমার এই ছোটো লেখার মাধ্যমে আমাদের স্মৃতির একটা দিকের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই – বিশেষ করে যেগুলো আমাদের স্মৃতি থেকে খুব তাড়াতাড়ি লোপ পেতে বসেছে।

অনেকেই বলেন পুরনো কথা, বিশেষ করে অপ্রিয় কথা, মনে রেখে লাভ কি? এতে শুধু নিজেদের টেনশন বাড়বে আমাদের, টেনশন বাড়লেও আমরা যদি আমাদের কতগুলো দিনের, বিশেষ করে কষ্টের ও খারাপ দিনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ না করি তাহলে আমাদের আরও অনেক খারাপ সময় আসবে। ইংরেজিতে বলে "আনলেস উই লারন ফ্রম হিস্ট্রি উই আর ডুমড টু রিপিট ইট্‌স্ মিস্‌টেক"। "ইতিহাস থেকে যদি আমরা না শিখি, তাহলে ইতিহাসের খারাপ ঘটনাগুলো আবার ঘটবে"। আমার ধারণা সাধারণভাবে বাঙালিরা – বাংলাদেশ, ভারত ও অন্যজায়গার ইতিহাস থেকে খুব কমই শিখেছি এবং আমার লেখাটা সেই বিষয়ের ওপরেই, তাই 'এমনেশিয়া' বলছি। এমনোশিয়া এক রকমের রোগ এবং কথাটার মানে 'লস অব মেমারি' বা 'স্মৃতিলোপ'। কম-বেশি সবাই আমরা এই রোগে ভুগছি।

বাংলা (আজকের বাংলাদেশ, ভারতীয় বাংলা এলাকা নিয়ে দেশভাগ-পূর্বের বাংলাদেশ অর্থে লিখছি) যদি ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত হতো তা হলে আমার ধারণা যে আমরা বলতাম আমাদের সমাজে গত ৪০-৪৫ বছরে অন্তত তিনটে 'হলোকস্ট' (Holocoust) হয়েছে। হলোকস্ট কথাটার অর্থ 'এ থরো ডেসট্রাকশন' বা সাধারণভাবে 'গণনিধন' 'গণমৃত্যু বা গণহত্যা'। দ্বিতীয় বিশ্ব

যুদ্ধের সময় হিটলারের ইহুদি ও ভারতবংশোদ্ভূত জিপ্সীদের (ও পরে সোসালিস্ট কম্যুনিস্ট ও স্লাভদের) গণহত্যার পর কথাটার ব্যাপক প্রসার হয়েছে। আমি এই কথা বললে প্রায় সব বাঙালিই বলেন "তিনটে হলোকস্ট কি করে ? একটাই খুঁজে পাওয়া মুশকিল"। মুশকিলটা সেখানেই।

পঞ্চাশের মন্বন্তর বা বিয়াল্লিশের মন্বন্তরের এর কথা অনেকেই শুনেছেন। সময় বাংলা ১৩৫০ বা ইংরেজি ১৯৪২। সেই মন্বন্তরেই মারা গিয়েছিলেন বেসরকারি-মতে ৬০ লক্ষ থেকে এক কোটির ওপর লোক। ইংরেজ সরকারের উড্হেড কমিশনেরহিসেব অনুযায়ী মারা যায় 'মাত্র ১৫ লক্ষ' লোক শুধু সাতটা জেলায়। এছাড়া অনাহার সংক্রান্ত অপুষ্টি ও রোগে মারা যান অনেক লোক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনৃথ্রপলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের মতে ৩৪ লক্ষ লোক মারা যায়, এবং আমেরিকার অধ্যাপক পল গ্রীনফ-এর হিসেব অনুযায়ী ৩৫ লক্ষ। দুঃখের বিষয় সে সময় বাংলায় বাম্পার বা স্বাভাবিকের থেকে বেশি ফসল হয়। এবং ঘটনাচক্রে বাংলা দেশের যে সব জেলায়—যেমন চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, ২৪ পরগনা (যেখানে কলকাতা অবস্থিত), মেদিনীপুর ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম বেশি দেখা দেয় সেখানেই দুর্ভিক্ষ আরও প্রকট হয়। এছাড়া দুর্ভিক্ষের কবলে ছিল খুলনা ও নোয়াখালী। ইংরেজ সরকার বলেন তাদের জাপান-জার্মান বিরোধী যুদ্ধের সময় বাংলার ফসলের দরকার ছিল। এছাড়া ইংরেজ সরকার দক্ষিণ বাংলায়, চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত, প্রায় সমস্ত নৌকা, ডিঙি, বজরা বাজেয়াপ্ত ও নষ্ট করে দেয়। সরকারি হিসেবে ৬৬,৫০০টি। যাতে ওগুলো জাপানিরা ব্যবহার না করতে পারে। অনেকে বলেন যে স্বাধীনতাকামীদের স্তিমিত করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যাই হোক ঘটনাটা মনুষ্যকৃত, এবং অনেকের স্মৃতিতে তাই 'মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষ' হিসেবেই আছে। কিন্তু স্কুলের বইয়ে কতটা জায়গা পাচ্ছে ?

ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত আছে আমাদের দ্বিতীয় হলোকস্ট। প্রথম বঙ্গ ভাগের (১৯০৫) পর থেকেই কলকাতা—ঢাকাতে আমরা বাঙালিরা ভ্রাতৃহত্যায় ভালো মতো হাত পাকিয়েছিলাম। সেসব আমাদের স্মৃতিতে খুবই কম আছে। সেগুলো, অবশ্য 'ছোটো খাটো' যা আমাদের একেবারেই মনে নেই। তারপর বড়ো আকারে আরম্ভ হয় ১৯৪৬-এ মুসলীমলিগ ডাকা 'ডিরেক্ট এ্যাকশন ডে' তে কলকাতার ও বাংলাদেশের অন্য জায়গায় বড়ো রায়ট বা 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'। ১৯৪৬-এর নোয়াখালীর দাঙ্গাতেই মারা যায় সরকারিভাবে কয়েক হাজার লোক। কলকাতা বা নোয়াখালীতে ক'টা স্মৃতিসৌধ আছে ? ভ্রাতৃঘাতী রায়ট

দাঙ্গা তো আমাদের সংস্কৃতির একটা অঙ্গ হয়ে গেছে। এই দাঙ্গা অবশ্য কিছুটা কমে ১৯৬৪-এর পর। তবে ১৯৬৪-এর দাঙ্গায় পূর্ববাংলা থেকে সরকারি হিসেবে লোক যায় ভারতে প্রায় ১০ লক্ষের মতো। সবাই প্রায় গরিব, চাষী, নমঃশূদ্র ও আদিবাসী। যার ধাক্কায় ত্রিপুরা হলো বাঙালি প্রধান, ও আন্দামান, অরুণাচল ও দণ্ডকারণ্যের বহু এলাকা। দেশ ভাগ জনিত হলোকস্টে মারা যায় বেশ কয়েক লাখ লোক, এবং তারপর উদ্বাস্তু শিবিরে, বস্তিতে, কত শিশু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নারী-পুরুষ মারা গেছেন তার হিসেব কেই বা করার চেষ্টা করেছেন! কেউ আমরা এই দুঃখ কষ্টের থেকে কিছু শিখিনি বলেই আমাদের তৃতীয় হলোকস্টের গণহত্যাটা মেনে নেওয়া অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার আমরা বাঙালিরা —মুসলমান-হিন্দু দুই-ই দাঙ্গার ব্যাপারে নিজেদের সাধারণত ধোয়া তুলসীপাতা মনে করি এবং সব দোষ সাধারণত 'বিহারী'দের ঘাড়ে চাপাই। এটাও আমাদের এমনেশিয়ারই দোষ। সামান্য কয়েকজন বিহারী যদি আমাদের এই রকমভাবে ব্যবহার (Manipulate) করতে পারে তাহলে আমরা নিজেদের শাসন করার ক্ষমতা রাখি? ·আর বাড়িঘর, জমিজমা সেগুলোও কি বিহারীরা সঙ্গে করে ঢাকা-কলকাতা থেকে পাটনা বা করাচীতে নিয়ে গেছেন? বাইরের লোক বিহারীরা যে আমাদের অনেক সময় প্ররোচিত করেছে, এবং একাত্তরের বাংলাদেশের গণ-হত্যায় তাদের অনেকে যে অংশ নিয়েছে তা সর্বজনবিদিত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ? এটাই আমার মতে তৃতীয় হলোকস্ট বা গণ-নিধন। এই ব্যাপারে ইয়াহিয়ার মিলিটারি বোধহয় হিটলারের মিলিটারির থেকে কোনো অংশে কম দক্ষ বা এফিশিয়েন্ট (efficient) ছিল না। কিন্তু এটাও আমাদের স্মৃতি থেকে লোপ পেয়ে যেতে পারে। এই মিলিটারি প্রথমে নির্বিচারে হিন্দু-মুসলমান হত্যা করে, পরে হিটলারি কায়দায় শুধু হিন্দু হত্যা করতে থাকে। বাংলাদেশে ধনতন্ত্র হবে না সমাজতন্ত্র হবে, ডান সরকার না বাম, ইস্লামী না জঙ্গী সরকার হবে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা যা হচ্ছে তা তো হবেই। এবং দরকারও। তবে সেই সঙ্গে যেন এই হলোকস্টটা স্মৃতি থেকে না হারিয়ে যায়। মুজিব, জিন্না, বা অন্য নেতাদের স্মৃতি মোছার চেষ্টা অনেকে করছেন, এবং পরেও করবেন। তার সঙ্গে যেন লক্ষ লোকের মৃত্যু, কোটি লোকের উদ্বাস্তু হওয়া সে-গুলোও যেন গল্প বা মিথ হতে চলেছে।

বাঙালির স্মৃতিতে অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। ১৯৬২-র হিন্দু-বাঙালি বিরোধী আসামে 'বঙ্গাল খেদা' দাঙ্গা। ১৯৬৪তে হলোকস্টটা কাশ্মীরে হজরত

বালমস্‌জিদে যুগাবতার মহম্মদের পবিত্র চুল হারিয়েছে গুজবে পুব বাংলায় ভয়াবহ 'হজরত বাল' দাঙ্গা। পরে পশ্চিমবাংলা, বিহার ও মধ্যপ্রদেশে। ১৯৮০তে ত্রিপুরায় বাংলাদেশি হিন্দু উদ্বাস্তু বিরোধী 'মান্দাই গণহত্যা'। তারপর ১৯৮৩তে আসামের বাঙালি (ও অসমিয়া ও আদিবাসী সহ) গণহত্যা। ১৯৬৯-৭১ এ কলকাতা ও আশেপাশে 'নকশাল নিধন'। আসামের কাছাড়, বাংলাদেশের একুশের মতোই, বাংলাভাষার জন্য পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েকজন প্রাণ দিয়েছেন ওই পঞ্চাশ দশকেই, আবার প্রাণ দিলেন ১৯৮৬তে। কিন্তু আমরা ক'জন সে খবর রাখি ? চিন্তা করে দেখা দরকার যে এর কতখানি আমাদের নিজেদের শিক্ষার জন্য জানা উচিত। আমরা ক'জনই বা জানি প্রথম বাংলা ভাগ কবে হয়, তা জোড়েই বা কবে ? আর প্রথম ভাগের পরিণতি দ্বিতীয় ভাগ।

যে দেশে স্বাধীনতার জন্য লড়াই হয়েছে সেই সব দেশে মিউজিয়াম করে অনেক কিছুই স্মৃতির মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা হয়। স্কুল কলেজের বইতে আমেরিকায় তো প্রত্যেক কাউন্টিতে এই ধরনের মিউজিয়াম আছে। অনেক ছোট শহরে ও গ্রামেও। আছে বইয়ের পাতায়। ঠিক তেমনি দেখেছি কিউবায়. মেক্‌সিকোতে, সোভিয়েত দেশে, ফ্রান্সে। কিন্তু দেশে ? ঢাকায় পেয়েছি শহীদ মিনার. সাভারে স্মৃতি সৌধ। এগুলো ভালো লেগেছে। তবে দরকার নিরক্ষর-সাক্ষর লোকেদের জন্য প্রদর্শনী ও মিউজিয়াম। কলকাতায় পেয়েছি অনেক মূর্তি, রাস্তার নাম ও মৌলালিতে নতুন তৈরি ছ'তলার ওপরে একটা ছোটো প্রদর্শনী। দরকার এই ধরনের প্রদর্শনীর, এবং আরও বড়ো ও ব্যাপক হারে।

আশার কথা 'একুশে' যে ভাবে কষ্টের মাধ্যমে শুধু স্মৃতি কোঠায় না থেকে জনজীবনে জায়গা করে নিতে পেরেছে, তেমনিই এমনেশিয়া রোগাক্রান্ত বাঙালিও আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত সময়গুলো ও তাদের শিক্ষা ভালো ও মন্দ— স্মৃতিতে জায়গা করে নিতে পারবে আমাদের শিক্ষাবিদ চিন্তাশীল ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সামান্য চেষ্টাতে ।

গ. এই বাংলা ওই বাংলা : বিদেশে

বিদেশে বাঙালি—বাংলাদেশি ও ভারতীয়

এক যুগেরও আগে আমেরিকার ফ্লরিডা রাজ্যের ট্যালাহ্যাসি শহরের এক প্রৌঢ় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রেড্ডির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এক পার্টিতে। তিনি জীবনের প্রথম বছর চল্লিশেক কাটিয়ে এসেছিলেন আমেরিকাতে। ডঃ রেড্ডি জাতিতে তেলুগু, জন্ম হয়েছিল তামিলনাডুতে, তখন মাদ্রাজ, ছিলেন বাংলা, মহারাষ্ট্র ও উত্তরভারতেও। বৈবাহিক সূত্রে যোগাযোগ অন্য জায়গার সঙ্গে। গল্প করতে করতে বলেছিলেন 'আমি একদিকে নিজে ভারতীয়, তবুও আমেরিকাতে এসে নতুন করে দেশকে জানতে পারছি।' অনেকেই হেসে বলেছিল 'বাতেলা'। অন্য সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, বিশেষ করে যারা নতুন এসেছে তারা। নতুন বিদেশে এলে সবারই কম-বেশি হোম্‌সিক্ লাগে। দেশের সবকিছুই আমাদের ভালো লাগে; সবকিছুতেই অন্ধভাবে সমর্থন করতে ভালো লাগে। তাজমহল, রবীন্দ্রনাথ, পুরীর মন্দির, গান্ধীজি থেকে আমাদের বর্ণবাদ (জাতিভেদ), ধর্মান্ধতা, আঞ্চলিকতা, বধূহত্যা, নকশাল হত্যা, খরা-মৃত্যু সবকিছুই। সবেরই একটা বিউটি (Beauty) খুঁজে পাওয়া যায়। সুরেনবাবু সবার কাছে মাফ চেয়ে বুঝিয়ে বলেছিলেন, "এখানে এসে যত প্রদেশের লোকের বাড়িতে গেছি, থেকেছি, তাদের জাতীয় ও আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি, যত রকমের ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছি, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গেছি, তাদের চিন্তাধারার কিছু অংশ প্রত্যক্ষভাবে জানতে পেরেছি, তত কি দেশে হয়? সেটাই বোঝাতে চেয়েছি।" অনেকটা ঠিকই। দেশে আমাদের ঘনিষ্ঠ সহপাঠী বা সহকর্মী না থাকলে আমরা কি চট করে তামিল, গুজরাতি, মণি-পুরী, নেপালি, পার্সী বা কলকেতিয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সামাজিকতা, আড্ডা বা উৎসবে যোগ দিতে পারি? আমিই তো ব্র্যাবোর্ণ রোড পাড়ায় বহুদিন কাজ করেও ওখানকার সিনেগগ্ (ইহুদি মন্দির) এ প্রথম গেলাম আমার এক বিদেশি ইহুদি বন্ধুর তাগিদে। আমাদের অনেকেই সেণ্টপলস্ গীর্জা বা আনোয়ার শা রোডের মস্‌জিদের পাশ দিয়ে লাখোবার যাই, কিন্তু দেখতে যাই কতবার? কলকাতার বাগদাদী ইহুদি বা বম্বের বেনে ইজরায়েলকে জানতে পারি এদের তৈরি নিউইয়র্কের বীণা এ্যাসোশিয়েশনের মাধ্যমে। ঠিক তেমনিই আমাদের বাঙালিদের একটা সাবকালচারকে খুঁজে পেতে সুবিধা হয়েছে নিউ ইয়র্কের

প্রবাসী বাঙালি খ্রিস্টান মারফৎ। আবার আমাদের অসমিয়া, ওড়িয়া, বিহারী বন্ধুদের আমন্ত্রণে তাদের দিকটা জানা-শোনা ও সংস্কৃতিকে উপভোগ করার সুযোগ হয়েছে বিদেশে। কলকাতার বাড়ির কাছে রাসবিহারী এভিনিউ-র শিখ গুরুদ্বারে যাওয়ার সুযোগ হয়নি (প্রথমবার সরাসরি যোগাযোগ হয়েছিল বাবার মৃত্যুতে এই গুরুদ্বারের সৎকার-ভ্যান ভাড়া করায়), কিন্তু তার আগে নিউ ইয়র্কের রিচমণ্ডহীল গুরুদ্বারে যাওয়ার সুযোগ ঘটে ভারতীয় অনুষ্ঠান দেখতে। তাছাড়া বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, শ্রীলংকা ও অন্য দেশের লোকেদের সঙ্গে সামাজিকতা করা ও জানারও সুযোগ পেয়েছি এবং পাচ্ছি বিদেশেই।

এই লেখা ভারতীয় বাঙালি ও বাংলাদেশিদের পরস্পরের জানার ওপরেই লিখছি।

এখানে একটা কথা লেখা দরকার যে বিদেশেও আমরা যখন ছোটো জায়গায় থাকি তখন অন্যদের জানা ও সামাজিকতা করার সুযোগ অনেক বেশি থাকে। আমরা যখন বড়ো জায়গায় যাই, অর্থাৎ যেখানে আমাদের সংখ্যা বেড়ে যায় তখন আমরা দেশের মতোই ভাষা, ধর্ম, প্রদেশ, জেলা, জাত, দল হিসেবে বিভক্ত হই। নিউইয়র্কের মতো জায়গায় ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকার মতো সব দেশের মন্ত্রীরা মাঝেমধ্যে এসব ছেড়ে এক হবার জন্য ডাক দেন। আমাদের বিভেদ আছেই এবং তা দেশের সমাজকেই প্রতিফলিত করে। ডমিনিক লাপিয়েরের কলকাতার 'সিটি অব জয়ের' একসঙ্গে কাছাকাছি ও আলাদা থাকারই মতো।

আমেরিকার বাঙালিদের বেশ কয়েকভাবে ভাগ করা যায়। এক তো হলো যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, আর অন্যরা হচ্ছেন ভারত থেকে আসা। এ-ছাড়া দুদেশের কিছুলোক এসেছেন ইংলণ্ড জার্মানি ক্যানাডা মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা ঘুরে। কিছুলোক জন্মেছেন বিদেশেই ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকায় এবং এখনও বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন—তাদেরকেই আমি বিদেশি-বাঙালি বলছি।

ভারতে বাঙালির বেশিরভাগই এসেছেন পশ্চিমবাংলা থেকে—প্রায় সবাই কলকাতার লোক। এছাড়া কিছু আছেন বিহার, মধ্যপ্রদেশে, উত্তর প্রদেশ, আসাম দিল্লি, মেঘালয় ও ওড়িশার। এদের বেশিরভাগই এসেছেন যোগ্যতার মাধ্যমে ইমিগ্রেশন নিয়ে অথবা উচ্চশিক্ষায় এসে থেকে গেছেন। এখন অনেকে আমেরিকার নাগরিকত্ব নিয়ে তাদের পরিবারের ভাই, বোন, বাবা, মা, স্বামী স্ত্রীকে স্পনসর করে ইমিগ্র্যান্ট হিসাবে নিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও

মোটামুটি একই ঘটেছে। তবে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরে লোক আসা বেড়ে গেছে। এর দুটি কারণ। এক তো স্বাধীনতার পরে বিদেশি সাহায্য, দান, ধার, বিদেশে পড়ার স্কলারশিপ সবই বেড়ে যায় তার ফলে। অন্যটা হলো সত্তর দশকে বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে লোক যাওয়া দারুণ বেড়ে যায়। এদের এক অংশ এবং তাদের ভাই-বোন এদের অর্জিত বিদেশিমুদ্রার সাহায্যে ইউরোপ আমেরিকায় যাওয়া, পড়া ব্যবসা করবার সুযোগ নেয়। এর সঙ্গে অন্য একটা ছোটো গ্রুপ আছে যারা বিদেশে এসেছেন মিশন, দূতাবাস বা বিদেশি সংস্থার কাজের মাধ্যমে।

এবার আমাদের ভাগাভাগির দিকটা আলোচনা করা যাক্। ভারতীয় বাঙালি-দের মধ্যে অঞ্চল, ধর্ম, জাত-এর ভাগ নেই বললেই চলে যা আছে ঘটি-বাঙালের পিছুটান। এদের মধ্যে অহিন্দু খুব কম তাই ধর্মীয় ভাগাভাগিটাও কম। ভারতীয় বাঙালি মুসলমানরা ঈদের নামাজ পড়তে যান ইস্‌লামী সংস্থা বা কোনো বাংলা-দেশি মস্‌জিদ আয়োজিত জামাতে। হিন্দুদের পূজা কমিটি এবং আড্ডার ক্লাব নিয়ে ভাগাভাগি অবশ্যই আছে।

বাংলাদেশির মধ্যে যদি ভাগ করতে হয় তবে সেটা কিছুটা রাজনৈতিক। এক দিন আছে প্রো-মুজিব বা আওয়ামীলিগ বা মুক্তিবাহিনী পন্থী। অন্য দল একটু বামঘেঁষা মিলিটারি বিরোধী এবং সেকুলার। এদের কেউ মুজিব-বিরোধীও হতে পারেন। অন্যগ্রুপ ভারত বিরোধী, কেউ কেউ বি. এন. পি. এর সমর্থক। বি. এন. পি র সবাই ভারত বিরোধী। অন্যদল ভারত বিরোধী, হিন্দু বিরোধী, ইস্‌লাম লিগ পন্থী। এদেরকে অনেকে পাকিস্তানপন্থীও বলেন। এছাড়া আছে সিলেটি গ্রুপ, যারা ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মকর্ম সব নিয়েই আছেন এবং নিজেরা সিলেটি বলে খুব গর্বিত। কিছুদিন আগে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকে নিউইয়র্কে সিলেটিভে বক্তৃতা করতে বলে অন্যদের চক্ষুশূল হন এই সিলেটিরা। এছাড়া উত্তরবাংলা ও চট্টগ্রাম সম্পর্কে গর্বিত কিছু লোকও আছেন। এই জন্য নিউইয়র্কেই বাংলাদেশি সংস্থা আছে বেশ কয়েকটা। এছাড়া বাংলা-দেশের হিন্দুও আছেন বেশ। খ্রিস্টান আছেন কিছু ও বৌদ্ধ অল্প দুয়েকজন। খ্রিস্টানরা নিজেদের সঙ্গে মেলামেশা করেন প্রবাসী সংঘের মাধ্যমে। রবিবারের প্রার্থনা ও বড়দিন হয় প্রবাসীর নেতৃত্বে (প্রবাসীর নামে সব শহরেই এক আধটা সংস্থা আছে। নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে অন্য একটা প্রবাসী ক্লাব আছে)। বৌদ্ধরা যান সব ভাষার বৌদ্ধ এ্যাসোসিয়েশনে। বাংলাদেশি হিন্দুরা যোগ দেন ভারতীয়

বাঙালিদের সঙ্গে দুর্গাপুজোয়, সরস্বতী পুজোয়। এদের মধ্যে হয়তো কেউ কেউ ভাবেন বাংলাদেশি হিন্দুদের নিয়ে কিছু করে নিজেদের সুখ দুঃখ আলোচনা করার কথা। তবে দেশে তাদের পরিবারের ক্ষতি হতে পারে ভেবে আর বেশিদূর এগোন না। এদের দেখেও মনে হয় বাংলাদেশে হিন্দুদের মনে এখনও কত অনিশ্চয়তা আছে। ১৯৮৫তে হিন্দুদের জগন্নাথ হল ভেঙে অনেক ছাত্র মারা গেলে আমেরিকাতে জগন্নাথ হলের এ্যালামনাই এ্যাসোশিয়েশনের লোকেরা টাকা তুলে জগন্নাথ হলে পাঠান। এঁরা সবাই হিন্দু। বাংলাদেশের হিন্দুরা সবাই তাদের গ্রাম জেলা সম্পর্কে অত্যন্ত গর্বিত। অথচ এদের কেউ কেউ বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজে তিক্ত অভিজ্ঞতা হওয়ায় নিজেদের বাংলাদেশিও বলতে চান না। এমনকি বাংলা দেশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে চান না। অন্যরা অবশ্য তা' নয়। আরও কিছু বাংলাদেশি আছেন যাঁরা বিদেশে এসেছেন পাকিস্তানি বা বাংলাদেশি নাগরিক হিসাবে, কিন্তু তাঁরা আসার পর তাদের মা, বাবা, ভাই, বোন সবাই দেশ ছেড়ে ভারতে গেছেন। তাই তাঁরা যখন 'দেশে' যান তখন আর তাঁদের গ্রামের বাড়িতে যান না। যান কলকাতায়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমাদের দুদেশের মধ্যে নিকটত্ব ও দূরত্বটা বোঝা যায়। একদিকে আমাদের মধ্যে একটা গর্ব আছে, আমরা দুদেশের লোক একই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। অর্থাৎ খুবই কাছাকাছি। ঠিকই। আবার দূরত্বটাও বেড়েছে কিছু ব্যাপারে। বাংলাদেশি লেখকদের ভাষাতেই 'পাকিস্তানিকরণ ও ইসলামীকরণ' ছাপ তো কিছু পড়বেই। অন্যদিকে স্বাধীন ভারতের রাজনীতি, লক্ষ লক্ষ হিন্দুর বাংলাদেশ ত্যাগ, এবং বাঙালি হিন্দুর বাংলায় মুসলমানদের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা।

ব্যক্তিগত ভাবে হিন্দু-মুসলমান, ভারতীয় বাংলাদেশিদের মধ্যে সুসম্পর্ক আছে। কিন্তু বড়ো জায়গায় যেখানে আমাদের সংখ্যা বেশি তখন নানাভাষী ভারতীয়দের মতোই অরগানাইজেশনালি (organisationally) দূরে সরে যাচ্ছি। সামান্য সামান্য সিম্‌বল (symbol) নিয়েই একে আরেকের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যেমন ছোটদের বাংলা পড়াবার পাঠশালাতে কোথাকার বই পড়ানো হবে সেটাই অনেকের কাছে ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। শিশুরা কিছু শিখল কিনা তার থেকেও। অনেকের ঘোরতর আপত্তি 'জল' কথাতে অন্যদের আপত্তি 'পানি' তে। হিন্দুরা পাঠশালাতে সরস্বতী পুজোতে কোনো আপত্তি দেখেন না, অনেক সময় সরস্বতীতে না থেমে দুর্গাপুজাও আরম্ভ হয়। সেটা তারা মনে করেন বাংলাভাষা

ও সংস্কৃতির অংশ। বাংলাদেশি মুসলমানদের এতে খুব আপত্তি এবং পুজো বাদে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতেও অনেকে গররাজি। আবার মুসলমানদের নিয়ে পাঠশালা করলেও অসুবিধা দাঁড়ায় ধর্মপ্রাণ লোকেদের নিয়ে। তাঁরা চান পাঠ-শালায় ধর্মশিক্ষা ছাড়াও আরবী শেখানোর। এতে হিন্দুদের আপত্তি এবং অনেক মুসলমানদেরও। 'বাংলা শেখানোর উভয়সংকট' নামে লেখায় ডঃ শেফালী দস্তিদার বিদেশে বাংলা শেখানোর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'প্রবাসী' পত্রিকায়।

কতকগুলো অনুষ্ঠান বাংলাদেশিদের কাছে খুব নিজস্ব। যেমন একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস (মার্চ), বিজয় দিবস (ডিসেম্বর)। এগুলো ভারতীয়-দের কাছে খুব তাৎপর্য বহন করে না! এতে বাংলাদেশিরা একটু আশ্চর্য হন ও দুঃখও পান। অনেকে ভাবেন তাদের প্রতি আমরা উৎসাহ দেখাচ্ছি না। আমরা পাকিস্তানে কেন, ভারতের কাছাড়েই বাংলাভাষায় লেখাপড়া করতে পারার জন্য জীবনদানের কথা কজন মনে রেখেছি? বছরটাই বা ক'জন মনে রেখেছি। অনেক সময় একুশের শহীদদের বা স্বাধীনতার যুদ্ধে শহীদদের স্মৃতির জন্য মোনা-জাত করা হয়। এতে অমুসলমানদের অসুবিধা। অসুবিধাটা দু'রকম। এক তো অনেকের ধারণা এতে বিধর্মী বা মালাউনদের থাকা অনুচিত। অন্য অসুবিধা হলো পুজো দেখা বা চার্চের প্রার্থনা দেখার মতো নয়—এখানে অংশ নেওয়া দরকার। আমাদের অনেকের 'বিছমিল্লাহির রাহমাণির রাহীম'ই মনে থাকে না তো 'রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাছনাতাও অ-ফিল আ খেরাতে হাছানাতাও অ কেনা আযারান্নার?……' মনে রাখার সুযোগ হয়? বাংলাদেশে, বিশেষত ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে তুলনামূলকভাবে বেশি হিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত হন। এমন ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের অনুরোধেও ধর্মপ্রাণ বাংলাদেশিরা কোনো হিন্দু রীতি মানাটা প্রায় দোষের মনে করেন। অনেকের কাছে 'দেশীয় সংখ্যালঘু' সহানুভূতি দেখানোটা ও 'হিন্দু-প্রেমী, বা 'ভারত-প্রেমী' হওয়ার সমান, এবং সেটা খারাপ। ভারতীয়রা তাদের স্বাধীনতা বা প্রজাতন্ত্র অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে অবশ্য বাংলাদেশিরা আসেন না।

এ তো শুধু নমুনা। সাংস্কৃতিক সংস্থার নাম, পত্র-পত্রিকার নাম, সম্পাদক, অনুষ্ঠানের পরিচালক, অভ্যর্থনার পোশাক, মেলা বা মীনাবাজার, খাওয়া-দাওয়ার মেনু সব কিছুতেই যেন দুজনরা দুদিকে টানছি। এর মধ্যে সেতু হচ্ছেন দুই-দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, এবং দুদেশের অতি অল্প লোক যারা একে অন্যের

অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যোগ দেন। এদের অনেকে খারাপ অর্থে 'ভারত-প্রেমী' নয়ত 'বাংলাদেশ-প্রেমী' ডাকেন। আমাদের মধ্যে প্রোগ্রেসিভরাও একে অন্যের মধ্যে সমঝোতা রাখতে পারেন না দেখে খারাপ লাগে। শংকরের লেখা 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' পড়ে ভালো লেগেছিল খুবই। হঠাৎ করে ১৯৮৬তে আমেরিকার ওহায়ো রাজ্যের ক্লীভল্যান্ডে দেখা হয়েছিল উনি যখন এসে-ছিলেন 'উত্তর আমেরিকার ষষ্ঠ বঙ্গ সম্মেলনে' যোগ দিতে। ওনাকে দেখে আবার সেই সুমধুর ওপারের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

৭

বাঙালিদের দল করার প্রস্তাব : নেট ওয়ার্কিং

আমেরিকাতে 'নেটওয়ার্কিং' (networking) কথাটা ব্যবহার করা হয় যখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় অল্পসংখ্যক লোক ছোট ছোট দলে ভাগ করে কোনো ইস্যু বা বিষয়ের ওপর আলোচনা ও মত বিনিময় করে। এই লেখাটা তার ওপরেই। ১৯৮৬তে ক্লিভল্যাণ্ড-এ বঙ্গ সম্মেলনে এই ধরনের আমার একটা ইংরেজি লেখা ও তার ওপর আলোচনা-সমালোচনা ভিত্তি করেই এটা লিখছি।

আমরা তো দলাদলিতে এক নম্বর, তার পরও দলাদলির প্রস্তাব! সুতরাং আমরা যে নতুন করে দল বা নেটওয়ার্কিং করব তা' কি আদর্শগত? আমাদের মতো ইমিগ্র্যাণ্টদের কোনো প্রয়োজন আছে এর জন্য? মতামত বিনিময়ের জন্য তার দরকার আছে? ছোটদের না বড়োদের জন্য? কোন জায়গায়? এছাড়া আরও অনেক প্রশ্ন আছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে বিদেশে আমাদের জীবন যতই জটিল ও দ্রুত হোক না কেন, অনেক কিছু ব্যাপারেই আমাদের নেটওয়ার্ক দরকার যা' নতুন-আসা ইমিগ্র্যাণ্টদের বা এখানে জন্ম আমেরিকান বাঙালিদের ভালো হবে। তবে বিষয়বস্তু কি হবে তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আমাদের বিদেশের নেটওয়ার্ক এখন মূলত ডিনার-এর মাধ্যমে হয়, পরনিন্দা পরচর্চা অবলম্বনে।

আমাদের বাঙালি সমাজটা কি রকম একটু বিশ্লেষণ করা দরকার। আমাদের সমাজ ও চরিত্র বোঝাতে গিয়ে শ্রীনীরদ চন্দ্র চৌধুরী তাঁর 'দ্য অটোবায়োগ্রাফি অফ্ এ্যান আননোন ইণ্ডিয়ান' গ্রন্থে লিখেছেন যে বাঙালিরা হচ্ছে,

"no better connoissuer of company was to be found any where in the world, and no one else was more dependent on the contiguity of his fellows with the same incomprehension in the obligations towards them. The man found the company he needed so badly and continuously readily assembled, with out any effort on his part, in his office, or in his bar-library, or in his college, which were no less places for endless idle gossip than for work" (p. 383)।

এটা তিনি এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা লিখেছেন। তাঁর দেশ ময়মনসিংহ সহ মেদিনীপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত বাংলাদেশের কথাই লিখেছেন। আমেরিকা আমাদের লাগাম ছাড়া আড্ডার সময় দেয় না! বাঙালিরা, আর পাঁচটা ভারতীয়র মতো অত্যন্ত পরিশ্রমী, উৎসাহ ও উদ্দীপনাময়, যাকে বলে "ভাইব্রেন্ট এ্যাণ্ড ফুল অফ্ এনার্জি"। তবে অফিসের কাজ বাদে এই উৎসাহ ও এনার্জির বেশিই চলে যায় আড্ডায়; এমনকি ধর্মের ব্যাপারেও আমরা হিন্দু-মুসলমানরা তেমন সময় দিই না যা অন্যভাষী হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টানরা দেয়। আমরা আমাদেরই এই শক্তির (এনার্জি) কিছুটা যদি অন্য গঠনমূলক সামাজিক-রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করতে পারি তো আমাদের সবারই অনেক লাভ।

'The herd loyalty of the inhabitants,' শ্রীনীরদ চন্দ্র চৌধুরী বাঙালি, বিশেষ করে শহুরে বাঙালিদের কটাক্ষ করে লিখেছেন, **'manifested itself even more strongly as violent hostility to the other fellow's set than as attachment to one's own set,'** এবং **'it is not in the nature of Bengali, or for that matter any Indian, to work by means of committees and councils'** এবং যখন কমিটি তৈরি করা হয় তখন : **'it does nothing but provide for the spirit of faction'** (p. 386)। এখন এই সামাজিক বিশ্লেষণ আমাদের প্রতি কতটা প্রযোজ্য? যদিও প্রত্যেক বাঙালি (ভারতীয়, বাংলাদেশি, আমেরিকান) আমাদের দলাদলির প্রবণতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন তবুও আমেরিকার মতো জায়গাতেও—যেখানে বাঙালিরা খুবই উচ্চশিক্ষিত—সেখানেও আমরা দলাদলির প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে দেশে এখন অন্তত ১০০টা রাজনৈতিক দল আছে—বাংলাদেশে ৭৪ এবং পশ্চিমবাংলায় ২৬—ত্রিপুরা, আসাম, বিহারের বাঙালি এলাকা বাদেই।

যেহেতু আমরা ছোট ছোট দল গড়তে ভালোবাসি, সেই জন্যই আমি নেটওয়ার্কিং এর কথা বলছি। এতে আমাদের মানসিকতার সঙ্গে কিছুটা মিল আছে। আর পাঁচ জনের মতো আমরাও নিজেদের দল, গ্রুপ, সার্কেল, নেটওয়ার্ক তৈরি করি। এগুলো সাধারণত পুরো আড্ডার, অনেকসময় পরনিন্দা পরচর্চা মিশিয়ে নিমন্ত্রণ বা দাওয়াৎ। আজকাল ভিডিওর কল্যাণে দেশি ও ব্লু ছবিও চলছে। শাদা, কালো, স্প্যানীয় ইমিগ্র্যাণ্টদের ছিল গীর্জা বা ইহুদী মন্দির যেখানে বিভিন্ন দেশ, ভাষা, এলাকা ও সংস্কৃতির লোকেরা মেলামেশা ও দেখা-

শোনা করতে পারত। আমাদের ওই ধরনের ধর্মীয় ইনস্টিটিউশন না থাকায় লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণের আড্ডায় গল্পগুজবে একে অন্যের সঙ্গে দেখাশোনা করি। এটা প্রায় একটা আধপাকা 'ইনস্টিটিউশন' বলা যায়, এবং যা ইনস্টিটিউশন এর অভাব মেটাচ্ছে। এই ধরনের ব্যবস্থার একটা সীমা আছে—বিশেষ করে যখন লোকজন বাড়তে থাকে, ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়, বড়ো শহরের যাতায়াতের দূরত্ব ও সময় বাড়তে থাকে।

আমার ধারণা এই 'ডিনার সার্কেল' থেকেই আমরা আমাদের নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারব। দরকার সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক বা মাসিক মিলিত হওয়া, এবং ছোটদের বা বড়োদের ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োজনীয় বিষয় বেছে নেওয়া। এ-গুলো ছোট হওয়া দরকার, বেশি লোক নিয়ে বড়ো করতে গেলেই বিপদের সম্ভাবনা এবং উল্টো ফল হতে পারে। মনে রাখা দরকার যে আমাদের—সব ভারতীয় সহ একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে যে আমরা অন্যদের জানতে বা বুঝতে চাই না। এই চরিত্রের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে শ্রীবদরুদ্দিন উমর তাঁর 'পূর্ববাংলার সংস্কৃতির সংকট'-এ লিখেছেন, "ইংরেজ-পূর্ব যুগে ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমূহেই ছিল তার সমাজ ও আর্থিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র। এ গ্রামগুলি ছিল দ্বীপসদৃশ এবং সারা ভারতবর্ষ ছিল বিশাল এক দ্বীপপুঞ্জ।...ভারতের সাধারণ গ্রাম্য জীবনযাত্রার মধ্যে বিপুল সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও গ্রাম সমূহের মধ্যে বিশেষ পারস্পরিক প্রয়োজনগত যোগাযোগ ছিল না"[১] (পৃ ১৩৬)। এটাই ঠিক করে দিয়েছে আমাদের সামাজিক আচরণের ধারা। অনেকদিক থেকে আমরা এখনও সেইরকম সামাজিক দ্বীপপুঞ্জে বাস করছি। সামাজিক বিবেচনা করে এবং সংখ্যার কারণেও ছোট ছোট দলের বাঁচার সম্ভাবনা আছে। তিন বা চার পরিবার নিয়ে শুরু করা যেতে পারে এবং সম্ভবত ছয় পরিবারের বেশি না হওয়াই ভালো। এর বেশি হলে এ্যাপার্টমেণ্ট বা বাড়িতে মেলামেশা করা কঠিন হবে এবং মেলামেশার জন্য জায়গা ভাড়া নিতে হবে। ডিনার-লানচ্ বাদ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। দল বিভিন্ন বিষয়-ভিত্তিক হতে হবে, যেমন : ক্লাব, পাঠশালা, গানের আসর, নাচ-গানের স্কুল, অডিও-ভিডিওর ওপর বক্তৃতা, গীতা বা কোরাণ ক্লাস, পাঠাগার বা আমাদের পুরোনো আমলের 'সাধারণ সভা'। অনেক জায়গায় এগুলো এখনও আছে। পূজা কমিটি, স্থানীয় মস্‌জিদ, ভারতীয় ও বাংলা এ্যাশোশিয়েশনগুলো আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রয়োজন খুব ভালভাবে মেটাচ্ছে—বিশেষত বড়োদের ক্ষেত্রে। তবুও এগুলো আমাদের সব প্রয়োজন

মেটাতে পারে না, যেমন একই সঙ্গে বড়ো ও ছোটদের, হিন্দু বা মুসলমানদের. কিংবা 'বাঙাল' বা 'ঘটি' বা 'সিলেটি'দের, অথবা উদারপন্থী বা চরমপন্থীদের। সুতরাং কোনো একদল সবকিছুর চেষ্টা না করে ছোট ছোট বিষয়ভিত্তিক দল করলে ভালো হয়। এবং কোনো একটি বিষয় যদি খুব সাফল্য লাভ করে তবে তখন তারা চেষ্টা করবেন যে ওই বিষয়ের নেটওয়ার্ক অন্য পাড়া বা কাউন্টিতে যাতে তৈরি করা যায়। যেমন, এখানকার গির্জা বা সরকারি স্কুলগুলো এলাকা ও লোকসংখ্যা অনুযায়ী নিজেদের ভাগ করে। স্বাভাবিকভাবেই ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুযায়ী একজন অনেক গুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। যেমন বৃহত্তর নিউইয়র্ক এলাকায় অনেকেই হয়তো বঙ্গসংস্কৃতি সংঘ, বাংলাদেশ লীগ, টেগোর সোসাইটি, ক্লাব, পাঠশালা গানের স্কুল, দুর্গাপুজো বা মসজিদ কমিটিতে অংশ গ্রহণ করেন। নতুন নতুন সংগঠন গড়ে উঠছে দেখে মনে হয় যে এই ধরনের নেটওয়ার্কিং করা সম্ভব এবং দরকার, অনেকটা হচ্ছেও। তবে দুঃখের বিষয় অনেকগুলো ব্যক্তিগত ভুল বোঝাবুঝি ও তিক্ততার ফল। কোঅপারেশন বা ফেয়ার কম্‌পিটিশনের তাগিদে নয়। আমি আশাকরি ছোট ছোট নেটওয়ার্ক করার ফলে রেষারেষি ও মাতব্বরি-করার-ইচ্ছা কমবে ; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অফুরন্ত কর্মক্ষমতা, উৎসাহ, গঠনমূলক কাজে ব্যবহার হবে। যখন দরকার হবে তখন আমরা বড়ো অনুষ্ঠানে মিলিত হয়ে করব যা একার পক্ষে করা অসম্ভব, যেমন বাংলা কনভেনশন, বাংলাদেশ সম্মিলনী, নববর্ষ, রবীন্দ্রজয়ন্তী, এমনকি পুজো বা ঈদ। মাঝেমধ্যে এক সঙ্গে কিছু করতে গেলে নিজেদের সুবিধা অসুবিধা ভালোমন্দ বুঝতে পারব। তবে এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে ছোট দলে থেকে যেন আমরা আবার 'প্রাক্‌-ইংরেজ ভারতের সেই দ্বীপপুঞ্জে' না ফিরে যাই। এবং যখন অন্য দলের সঙ্গে নেটওয়ার্ক করব তা যে শুধু বাঙালি বা ভারতীয়দের সঙ্গেই করব তা' নয়, অবশ্যই সাদা, কালো, স্প্যানীয়, খ্রিস্টান, ইহুদী, ডেমোক্র্যাট, রিপাবলিকান্‌ সবার সঙ্গেই করব। ছোট নেটওয়ার্কে আমরা নিজেদের সত্তা বজায় রাখতে পারব, আবার জাতীয় ইস্যুর নেটওয়ার্কে অন্যদিকটাও জানতে পারব। অদূর ভবিষ্যতে এর মধ্যে থেকেই কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে উঠবে, তবে সেটা যে একান্ত দরকার তা' নয়।

উল্লেখপঞ্জী

১. বদরুদ্দীন উমর : 'পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট,' নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭১।

বাংলা স্কুল : উভয় সঙ্কট*

প্রবাসে বাঙালির কৃষ্টি ও সভ্যতা বজায় রাখার গুরুদায়িত্ব এখানকার বাঙালিদের হাতে। বাঙালি সংস্কৃতির স্রোতধারা জিইয়ে রাখার একমাত্র শক্তিমান মাধ্যম হলো ভাষা। আমরা বেশ কিছু ভাগ্যান্বেষী বাঙালি দেশ ছেড়ে অনেক দূরে এসেছি আর সঙ্গে এনেছি আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতির প্রতি দরদ আর মা-বাবার দেওয়া মূল্যবোধটুকু। আমেরিকার ইমিগ্রেণ্ট বাঙালিরা স্বকীয়তা (identity roots) সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন, তবে তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

এদেশে আমাদের ছেলেমেয়েদের বাংলাভাষা শেখানোর সমস্যা অনেক, মাতৃভাষা শেখানোর ইচ্ছে থাকলেও উপায় খুবই কম। প্রধান সমস্যাগুলি হচ্ছে :

১. প্রতিষ্ঠানের অভাব

২. মা-বাবার উৎসাহের অভাব।

৩. ছেলে-মেয়েদের বাংলা পড়ার ইচ্ছে বা উৎসাহের অভাব

৪. বাংলা স্কুল খোলা ও চালানোর সমস্যা।

আমাদের বাঙালি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোনো ঘর নেই, কোনো কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানও নেই যেখানে বাংলা ভাষা শেখানো যেতে পারে। আমরা ধরে নিচ্ছি অনেক অসুবিধে সত্বেও কয়েকজন উৎসাহী বাঙালি ছোট গ্রুপ-এ বাংলা শেখানো শুরু করেন। এই বাংলা স্কুলের প্রধান উদ্দেশ্য হবে :

ছেলেমেয়েদের বাংলা ভাষা শেখানোর অর্থাৎ বাংলায় পড়া ও লেখা দুটোই যাতে তারা শিখতে পারে তার উপযোগী করে তুলতে হবে। তাদের মাতৃভাষায় কথা বলা সম্বন্ধে মা-বাবাকে রক্ষণশীল হতে হবে।

বাংলা ভাষায় যাতে তারা কথা বলতে পারে সেজন্য মা-বাবার দায়িত্ব হলো যে অল্প সময় তারা মা-বাবার সঙ্গে থাকে, সেই সময়টা বাংলায় কথা বলা, যাতে দেশে গেলে তারা যেন দাদু-ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলতে পারে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গতবছর দেশে যাবার পথে মস্কোতে রীতার কথা। রীতা আসামের মেয়ে। সঙ্গে চলেছে ওর ৯ বছরের মেয়ে সরিতা। রীতার স্বামী ফরাসি-ভাষী। সরিতাকে ফরাসি ও অসমিয়া দুটো ভাষাই শিখিয়েছে রীতা।

রীতা চলেছে ওর মা-বাবার কাছে। সরিতাকে ও যদি অসমিয়া না শেখাত তা হলে সরিতার দাদু-ঠাকুমার সেটা নিশ্চয়ই ভালো লাগত না।

বাঙালির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া প্রয়োজন। ছেলেমেয়েদের সবরকম বাংলা অনুষ্ঠান, উৎসব-পার্বন, সিনেমা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। বাংলা স্কুলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া হবে তার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

আমাদের যে প্রধান সমস্যা---বাংলা প্রতিষ্ঠানের অভাব, সেটা যদি না থাকে, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান হবার পরেও বা বাংলা স্কুল হবার পরেও নানারকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। বাংলা স্কুল খোলার উদেশ্য কি ? আমাদের প্রধান, গুরুত্বপূর্ণ ও একমাত্র উদ্দেশ্য হবে বাংলা ভাষা শেখানো। এখানে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে ভাষার সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কোনো যোগ আছে কি? এক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে যদি কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা জোর করে ভাষা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা ঢোকাতে চান মা বাবার অমতে। এমন ক্ষেত্রে অনেক মা-বাবা তাদের ছেলেমেয়েদের বাংলা স্কুল থেকে নিয়ে যান। এরপর বাড়িতে পড়ানোর চেষ্টা করেন অনেক অসুবিধে সত্ত্বেও। তার ফলে ধীরে ধীরে বাংলা স্কুল বন্ধ হয়ে যেতে পারে ছাত্রাভাবে। অপরপক্ষে মা-বাবা যদি চান ছেলে মেয়েদের নিজস্ব ধর্ম সম্বন্ধে জানা দরকার তাহলে মা-বাবার দায়িত্ব হবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাদের নিয়ে যাওয়া, সে বিষয়ে গল্পের মতো করে তাদের জানানো। কিন্তু বাংলা স্কুল, যেখানে ভাষা শিক্ষাই একমাত্র উদ্দেশ্য, ধর্মীয় শিক্ষা সেখানে না দেওয়াই ভালো।

এখানে বলা বাহুল্য, অনেকে তর্কের খাতিরে বলতে পারেন, 'তাতে কিছু যায় আসে না। বাংলা পড়ালেই হলো।' এতে দেখা যাবে যাদের ছেলে-মেয়েদের বাংলা শেখানোর তেমন উৎসাহ নেই, বাংলা শেখানোর বিশেষ পক্ষপাতী নন, অথবা বাংলা শেখানোয় বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান না তাঁরা তখন উৎসাহ দেবেন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার জন্য। কেউ হয়তো বলবে, 'বাংলা শিখিয়ে কি হবে ? সেই তো এদেশেই থাকবে। আর এখানেই বড় হবে।' আবার কেউ বলবে, 'বাংলায় প্রথম ভাগ, তারপর দ্বিতীয় ভাগ, এর বেশি শিখে তাদের কি হবে ?' কাজেই প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করার মাঝে অনেক কিছুই করা যেতে পারে। আরও একদল আছে যারা বলবে, 'উঃ বাঁচা গেছে, এখানে একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দরকার ছিল। এত দূর প্রত্যেকবারে যেতে হয়, তায় গাড়ি পার্কিং-এর জায়গা পাওয়া যায় না।' ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধরনের চিন্তাধারা থেকে বাংলা স্কুলকে

অনেকে সমর্থন করে। উৎসাহ দেয় বড়ো আকারের ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার। এদের আলোচনা থেকে মনে হয় এমন জায়গা সত্যিই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্যই আদর্শ-স্থান। কিন্তু এরা বিচার করে দেখে না যে, কিছু কিছু মা-বাবা চেয়েছিল তাদের ছেলে-মেয়েকে বাংলা শেখাতে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, দেশের মতো এদেশেও এখন প্রায় পাড়ায় পাড়ায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। সবারই এক মন্তব্য, সব জায়গাতেই প্রতিযোগিতা আর দলাদলি। কিন্তু তার ভেতর থেকে বাংলা স্কুলকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব কাদের হাতে? এমন কোনো প্রতিষ্ঠান আছে যে এই স্কুলকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে?

---

* এই প্রবন্ধটি লিখেছেন ডঃ শেফালী ঘোষদস্তিদার

ঘ. চলুন যাই বেড়াতে

যদি বেড়াতে যান : ঢাকা

যদি কেউ পারিবারিক কাজে সীমান্তবর্তী কোনো গ্রামে সরাসরি না যান তার পক্ষে ঢাকা না গিয়ে উপায় নেই। কলকাতা পশ্চিমবাংলার কাছে যা, ঢাকা কয়েক দিক দিয়ে বাংলাদেশের কাছে প্রায় তাই। তবে অতটা নয়। বৃহত্তর কলকাতায় পশ্চিমবাংলার প্রায় ২০% লোক থাকেন, আর শহরতলি ও দৈনন্দিন যাতায়াতের কম্যুইটিং এলাকা ধরলে হয়তো রাজ্যের ৩০%—৪০% লোকের বাস। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে ঢাকায় লোকসংখ্যা ছিল আট লাখের মতো। এখন বেড়ে হয়েছে ২০ লাখের ওপরে। ঢাকা নগরীর লোকও যেমন বেড়েছে, এর পরিধিও বেড়েছে অনেক। যাঁরা অনেক দিন আগে ঢাকা দেখেছেন তারা হয়তো নতুন ঢাকাকে চিনতেও পারবেন না। তবে তাঁদের স্মৃতিজড়িত পুরনো ঢাকাও আছে। পুরোনো লোকজনও অনেকক্ষেত্রে আছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নেই।

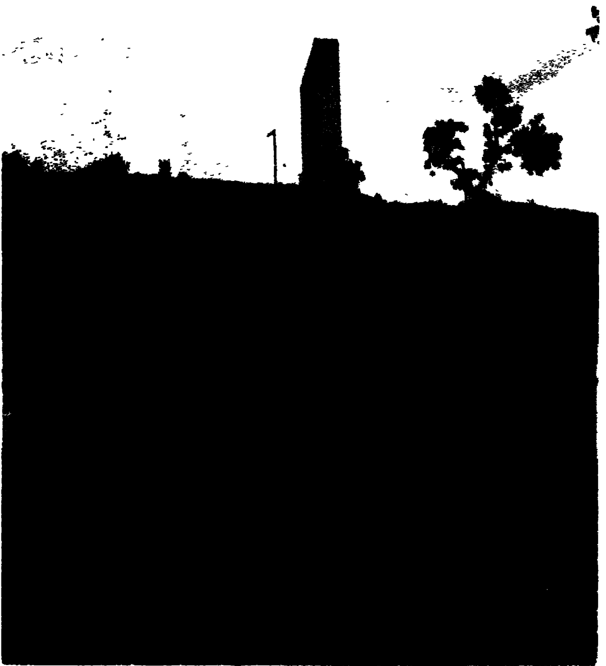
ঢাকা যাওয়ার সোজা দুটো পথ আছে। একটা হলো প্লেনে। মাত্র কুড়ি মিনিটের পথ। কিন্তু কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, প্লেন লেট নিয়ে দাঁড়াবে কয়েক ঘণ্টায়। (প্লেন লেটের ব্যাপারে বাংলাদেশ বিমানের চেয়ে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বদনাম অনেক বেশি)। আর অন্যটা বনগাঁ বেনাপোল হয়ে ঢাকা। এছাড়া ইচ্ছে করলে আগরতলা থেকে কুমিল্লা হয়ে ঢাকা। আবার বনগাঁ বেনাপোল দিয়ে গেলে যশোর থেকেও বিমানে ঢাকা যাওয়া যায়। বেনাপোল-ঢাকা প্রায় আটঘণ্টার পথ —কয়েকটা ফেরীর জন্যই সময় বেশি লাগে। কয়েক বছর আগে বনগাঁ-যশোরের রাস্তা এত খারাপ দেখেছিলাম যে আর কোনোদিন ওপথে যাব না ঠিক করেছিলাম। এত খারাপ রাস্তা বাংলাদেশে আর কোথাও দেখিনি। উত্তর ও দক্ষিণ বাংলা, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা থেকেও সীমান্ত পার হওয়া যায়।

ঢাকায় এখন থাকার জায়গা প্রচুর। পাঁচতারা হোটেলের মধ্যে পূর্বাণী, ইন্টারকনটিনেন্টাল, সোনার গাঁও। এগুলোর খরচা কলকাতার গ্র্যাণ্ড, গ্রেট-ইস্টার্ন, হিন্দুস্তানের মতো। মাঝারি খরচার হোটেলও আছে অনেক। আর পুরোনো ঢাকায় আছে সস্তা দামের হোটেল। আমাদের পাইস হোটেলের মতো। নবাবপুর রোড ও তার আশেপাশে অনেক হোটেল আছে। আগে যারা পূর্ববাংলা-কলকাতা যাতায়াত করতেন তাদের অনেকেই এইসব হোটেলে রাত

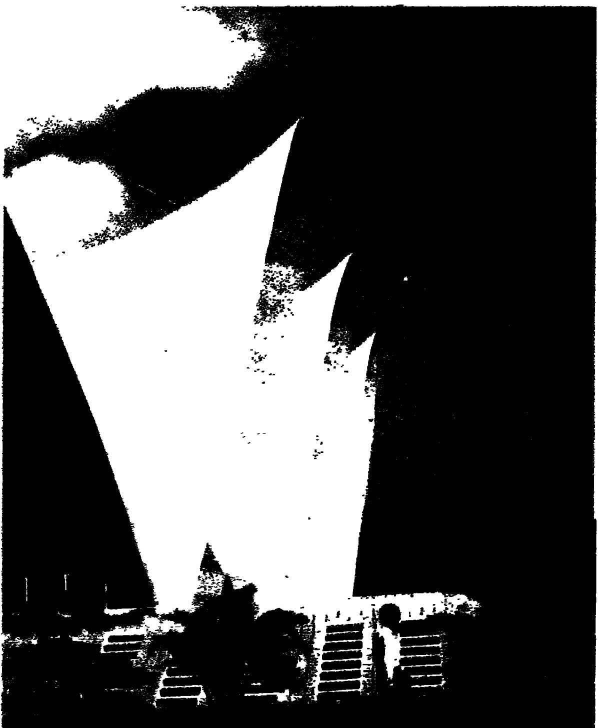
কাটিয়ে স্টিমার ধরতেন। ঢাকায় অনেক জায়গায় ঘুরেছি ও হোটেলে খেয়েছি, তার মধ্যে নবাবপুর রোডের শান্তি হোটেলের দাসগুপ্তবাবু ও তাঁর কর্মচারী নরেনের কথা ভোলা মুশকিল।

আয়তনের তুলনায় ঢাকায় দেখার জিনিস অনেক আছে। তার মধ্যে যে-গুলো আমায় বারবার করে সবাই বলে দিয়েছিল সেগুলো হলো—নতুন ঢাকা, ঢাকেশ্বরী মন্দির, বায়তুল মোকারাম মসজিদ, শহিদ মিনার, রমনার মন্দির প্রাঙ্গণ ও সঙ্গের বাংলার তিন নেতার মাজার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, স্থপতি লুইকান-এর নকশায় তৈরি শের-ই-বাংলা নগরে সংসদ ভবন। এছাড়া এর সঙ্গে যোগ করা উচিত পুরোনো ঢাকা, বর্ধমান হাউসে অবস্থিত বাংলা একাডেমি ও ঢাকার বাইরে অবস্থিত সাভারে '৭১এর শহিদ স্মৃতি স্তম্ভ। সাভারে গেলে যাওয়া ও আসার পথে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় ঘোরা যায়। এছাড়া আছে নতুন চিড়িয়াখানা, বটানিক্যাল গার্ডেন ও অনেক পুরোনো মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, স্কুল। এছাড়া কারও কাছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনিবাস বঙ্গভবনও দেখার যায়গা। অনতিদূরে আছে ধানমণ্ডি, অভিজাতদের থাকার জায়গা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাড়ি। এখানকার নতুন আভিজাত্যপূর্ণ জায়গা হলো গুলশান ও বনানী যার ফ্ল্যাটের মাসিক ভাড়া অনায়াসে পনেরো থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা (বাংলাদেশ) হবে।

নতুন ঢাকা বাদে আমার সব কিছুই ভালো লেগেছে। নতুন ঢাকাকে অনেকটা নতুন দিল্লি বা চণ্ডীগড়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অথবা দুর্গাপুর বা সল্টলেক—এতে আর স্পেশাল কিছু নেই। আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে পুরোনো ঢাকা। যাকে অনেকটা পুরোনো কলকাতার সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে সাধারণভাবে কলকাতার থেকে বেশি পরিচ্ছন্ন। পুরোনো ঢাকায় উত্তর কলকাতা, ভাটপাড়া, শ্রীরামপুরের মতোই বেশ বনেদী ছাপ আছে এবং আছে অনেক ইতিহাসের সঙ্গে যোগ। আমার পছন্দ দক্ষিণ কলকাতার চেয়ে উত্তর কলকাতা বা নতুন দিল্লির চেয়ে পুরোনো দিল্লি। এককালে পুরোনো ঢাকার অনেক জায়গায় একশ' ভাগের মতো হিন্দু ছিল, তাই অনেক পুরোনো মন্দির আছে। তবে অনেক মন্দিরই বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। পুরোনো মুসলমান পাড়াতে আছে পুরোনো মসজিদও।[১] পুরোনো ঢাকাতেই আছে রামকৃষ্ণ মিশন রোডে রামকৃষ্ণ মিশন। বাইরে থেকে ছোটো একটা বোর্ড ছাড়া বোঝবার উপায় নেই। ভেতরে দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল, ছাত্রাবাস, অফিস, মন্দির গেস্ট-হাউস, আশ্রমিকদের থাকার যায়গা। সবই আছে। ভিতরটা পরিষ্কার



হিদ মিনার - ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনেব শহিদদের স্মৃতি স্মরণে



ঢাকার বমনায় তিন নেতার মাজার



হেলানো মঠ - মাহিলাড়া বরিশাল



ঢাকার নতুন সংসদ ভবন

পরিচ্ছন্ন। চারিদিকে ফুলের বাগান। লোকজনে ভরা। ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্ম "বড়লোক" বা 'বড়কাজের' মধ্যে বেশি জড়িত বলে আমার ধারণা থাকলেও এখানে তারা গরিবদের সঙ্গে সরাসরি জড়িত দেখে ভালো লাগল। বিশেষ ভালো লেগেছিল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান স্বামী অক্ষরানন্দর সঙ্গে কথা বলে। এই রামকৃষ্ণ মিশনের ডাইনিংরুম আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে তৈরি হয়েছিল ঢাকার নবাবের মেয়ের দানে। মনে হয় বাংলাদেশে হিন্দু প্রতিষ্ঠান যা আছে তারা গরিবের কাছে যাওয়ার আগেই গরিব ও মধ্যবিত্তরাই এগুলোকে টেনে নিয়েছে। আমার দুচারজন বাংলাদেশি এই বিষয়ে দুঃখ করে বলেছেন যে "বাংলাদেশে হিন্দুরা আপনাদের (ভারতীয়) থেকে অনেক বেশি কনসারভেটিভ"। এটাই স্বাভাবিক; অস্তিত্ব নিয়ে যেখানে টানাটানি সেখানে এটা হবেই। পৃথিবীর ইতিহাসে তার নমুনা প্রচুর আছে।

ঢাকায় যাতায়াতের জন্য রিক্সা ছাড়া উপায় নেই এবং এটাই সবচেয়ে ভালো। সবচেয়ে শস্তা। রিক্সাগুলোও দেখবার মতো রং বেরঙের এর ছবি, শ্লোগান, এবং পবিত্র কোরাণ ও হাদিসের উদ্ধৃতিতে ভরা। ঢাকা শহরকে রিক্সা নগরী বললে ভুল হবে না। দূরে যেতে গেলে বাস বা বেবী ট্যাক্সি (অটো)। বাস-বাদে সবকিছুরই আগে দর করে উঠতে হয়। এছাড়া বড়ো ট্যাক্সি ও সমবায়ের গাড়িও কিছু আছে। ট্যাক্সি ভাড়া বা জিনিসপত্রের দামের ব্যাপারে একটু তৈরি থাকা উচিত। যা ভাড়া বা দাম চাইবে তা আনকোড়া কানে অত্যধিক মনে হবে। একে তো বাংলাদেশি টাকার দাম অনেক কম সেটা মনে থাকে না, তারপর জিনিস পত্রের দাম অনেক বেশি। অনেককিছুই বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়।

একটা কথা বলা দরকার দুদেশের মধ্যে অনেককিছুতে সুসম্পর্ক থাকলেও অনেক ব্যাপারে সেই পাকিস্তানি আমলের ধারা চলে আসছে। যেমন পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক না থাকলেও অমৃতসর-লাহোর ট্রেন চলাচল করছে। কিন্তু কলকাতা-যশোর রেল যোগাযোগ এখনও বন্ধ।

কলকাতা থেকে ঢাকা যেতে লাগবে ভিসা। এবং সাধারণভাবে বাংলাদেশ সরকার চাইবেন স্পনশরশিপ। অর্থাৎ সেদেশে কে ডেকেছে এবং কে ভরনপোষণ করবে তার জবাবদিহি। ভারত সরকারও তাই চান। ভারত সরকার আজকাল টুরিস্টদের নিজেদের খরচায় সারা পৃথিবী ঘোরার অনুমতি দেন ও সেইজন্য বিদেশি মুদ্রার ছাড়ও দেন। অনেকে এইরকমভাবে সুদূর আমেরিকাতেও আসেন। সে ক্ষেত্রে পাশাপাশি বাংলাদেশে না যেতে দেওয়ার কোনো কারণ দেখি না।

উল্লেখপঞ্জী

১. বাংলাদেশের কিছু মানুষ, সংখ্যাগুরু মুসলমান চিন্তাবিদ্‌দের একাংশ, তাদের পুরোনো হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির নমুনাগুলো বাঁচাতে আগ্রহী। এই রকমই একটা লেখা অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন-এর 'পুরোনো ঢাকার ঘরবাড়ী' ইদ সংখ্যা, বিচিত্রা, পৃ. ২২-৩৪।

যদি বেড়াতে যান : নদীবক্ষে বাংলাদেশের রকেট

ভারতে বাঙালিদের নাম আছে বেড়াতে ভালোবাসে বলে। কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর, কচ্ছ থেকে কোহিমা যেখানেই বেড়াতে গেছি সেখানেই বাঙালি টুরিস্ট দেখেছি। তবে সুদূর কন্যাকুমারীতে যত বাঙালি টুরিস্ট দেখেছি তার ভগ্নাংশ দেখেছি পশ্চিমবাংলার পুব দিকে, অর্থাৎ আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যাণ্ড সহ উত্তরপূর্ব ভারত এবং বাংলাদেশে। ব্যক্তিগতভাবে আমার আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা ও সিকিমের কিছু নাম-না-জানা জায়গা ভারতের বিখ্যাত দ্রষ্টব্য জায়গার মতোই লেগেছে। তেমনি বাংলাদেশের অনেককিছুই টুরিস্ট হিসাবে ভালো লেগেছে।

বাংলাদেশের সবার কাছেই বেড়াবার কথা জিজ্ঞেস করলে দুটি জায়গার কথা সবাই বলেন। একটা হলো সুন্দরবন ও অন্যটা হলো কক্সবাজার। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই লেক-এর কথাও কেউ কেউ বলছেন। সুযোগ থাকলেও এর কোনোটাই আমাকে আকৃষ্ট করেনি। সুন্দরবন দেখতে বাংলাদেশে কেন যাব যখন কলকাতা থেকে যাওয়া এত সুবিধা? আর কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত হিসাবে বিখ্যাত। কলকাতার কাছেই আছে দীঘা, পুরী, গোপালপুর। আমার যেটা সবচেয়ে আনন্দদায়ক মনে হয়েছে সেটা হলো 'রকেট স্টিমার সার্ভিস'। ঢাকা থেকে বরিশাল।

বাংলাদেশের মানচিত্র দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে জলযান ও জলপথ এ দেশের পক্ষে কত গুরুত্বপূর্ণ! আমার বন্ধুবান্ধবের কাছে বরিশাল বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব করাতে সবাই 'রকেটে' যাওয়ার উপদেশ দিল। 'রকেট' একটা নাম-মাত্র। যেমন কলকাতা-দিল্লি ট্রেনের বিভিন্ন নাম দিল্লি মেল, তুফান, জনতা রাজধানী—তেমনিই। বাংলাদেশে জলপথে সরকার কিছু সার্ভিস রাখলেও বেশির ভাগ জলযানই ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট। রকেট সরকারি সার্ভিস। ঢাকা-বরিশাল অনেকগুলো লঞ্চ ও স্টিমার যায়। কোনো কোনো লঞ্চে ১৫০—৩০০ জন লোক নেয়। আর স্টিমারে অন্তত ৫০০ জন। কোনো লঞ্চে বরিশাল যেতে সময় নেয় ৭ ঘণ্টা, কেউ বা তার কম বা বেশি। মাস-কাল বুঝে এই সময় কমে-বাড়ে। বড়ো হোটেল গুলোতে এসব স্টিমার লঞ্চের খোঁজ পাওয়া যায় এবং টিকিটও কেনা যায় অনেক সময়। এ ছাড়া ঘাটে গিয়েও টিকিট কেনা যায়। আমি বরাবর কিনেছি

ঢাকার বাণিজ্যিক কেন্দ্রস্থল মতিঝিলে বাংলাদেশ ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটির অফিসে গিয়ে।

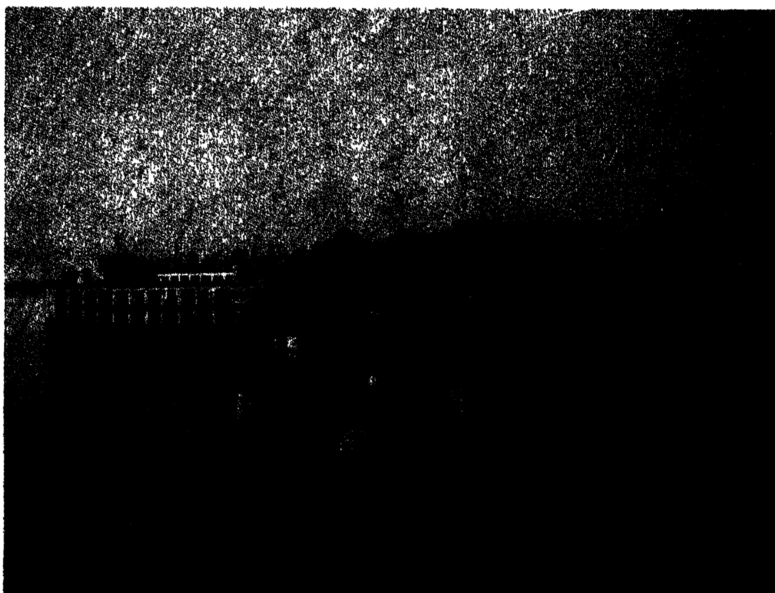
লঞ্চগুলো বিভিন্ন আকারের, নানান রঙে ও নানান রকমে সাজানো থাকে। এগুলো অনেকটা কলকাতা-হাওড়া ফেরী লঞ্চের মতো এবং সবগুলোই প্রায় তিনতলা। রকেট স্টিমারগুলো হচ্ছে ছোটোখাটো জাহাজ। আমরা যেগুলো চড়েছি সেগুলো জাপানে তৈরি এবং কোনো নামী ব্যক্তির নামে নাম করা; যেমন 'শহিদ ইমাদুল হক,' 'গাজী'। টিকিটের হার চতুর্থ ক্লাসে অল্প কয়েক টাকা থেকে ফাস্ট ক্লাস বা কেবিনে ভারতীয় ২০ টাকার মতো। ভারতীয় এক টাকাতে বাংলাদেশি দুটাকার বেশি পাওয়াতে সব খরচাই অর্ধেকের কম।

বরিশালে থাকার জন্য প্রথমে চিন্তা হয়েছিল। বাংলাদেশের সব প্রধান শহরেই পর্যটন বিভাগের 'পর্যটন হোটেল' আছে। বরিশাল এর ব্যতিক্রম। খোঁজখবর নিয়ে কয়েকটা থাকার জায়গার খোঁজ পেলেও সবাই 'ময়ুর' হোটেলেই থাকতে বলে। এছাড়া বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারি সংস্থারও নিজেদের লজ বা গেস্ট হাউস আছে। এগুলোও ভাড়া পাওয়া যায়, এবং এগুলোতেও আমরা থেকেছি। একবার অবশ্য আমাদের বন্ধুর বন্ধু শ্রীসুরেন্দ্র নট্ট আমরা আসছি জানতে পেরে একেবারে পোঁটলা-পুট্‌লি সহ তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান প্রায় 'কিডন্যাপ' করে পাছে হোটেলে উঠি। আগেই বলেছি বাংলাদেশি আতিথেয়তা, সেটা ঠিক লিখে বোঝান যাবে না। যেখানেই গেছি এবং যে কোনো লোকের কাছে চেনা অচেনা সবার কাছেই আতিথেয়তা পেয়েছি দারুণ। ঢাকার নাজমুন্নেসা, মিলনদি, কর্নেল রহিম, স্বামী অক্ষরানন্দ, কর্ণেল রশীদ, হোসেন তালুকদার, বরিশালের আব্দুল, পূজারী মানিকবাবু, গোলক, স্বদেশ, লক্ষণকাঠির হারাণবাবু, আলো, কুমিল্লার রঞ্জন, যশোরের মহম্মদ, মাহিলাড়ার কমলামাসী, কুপাতনগরের কুলুবাবুরা ও ঘরামীবাবু। এছাড়া আরও অনেক অনেক লোক আছে। (সুরেন্দ্র-বাবুর থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য আমরা ভোর পাঁচটায় সবার ওঠার আগে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই। স্পেশাল অর্ডার ইলিশ, পাবদা ও 'গ্রামের বাড়ি' বেড়ানোর অফার তখনও হাতে ছিল।) ময়ুর জাতীয় হোটেলগুলি আমাদের শিলিগুড়ি, শিলং, শিলচর-এ মাঝারি খরচার হোটেলের মতো। এছাড়া ঘাট বা নদীবন্দরের কাছে অল্প খরচার 'পাইস হোটেল'ও আছে। সরকারি গেস্ট হাউসগুলি খরচা প্রায় অর্ধেক এবং সেখানে দেখাশুনা-রান্না করার লোকও থাকে।

গল্পে পড়েছি এবং লোকমুখে শুনেছি যে পূববাংলায় অনেক 'হিন্দু হোটেল'



. বাংলাদেশের নদীপথের দৃশ্য



. বরিশাল সদর ঘাট

ছিল। একমাত্র কুতুবদিয়া ফেরী ঘাটে এক 'হিন্দু হোটেল' চোখে পড়ে। এছাড়া ওই ফরিদপুর জেলারই চেকের হাট ফেরীতে পেয়েছিলাম 'চেকের ফেরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' যা হিন্দু খাওয়া পরিবেশন করে। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম মালিক শ্রীআদিত্য ঘোষ হিন্দুদের পূজা-পার্বনের মিষ্টি তৈরি করতে ওস্তাদ। কিছু নমুনা পেয়েছিলাম। আদিত্যবাবুর সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়নি, তিনি মাল কিনতে গিয়েছিলেন। সেদিন আমাদের দেখাশোনা করে তার সুযোগ্য এ্যাসিসটেণ্ট হারাধন রহমান। চেকের হাটের কাছেই সাধুর ব্রীজ বাস স্টপে নেমে বাজিতপুরের প্রণব মঠ যাওয়া যায়।

আমাদের রকেট সকাল দশটা নাগাদ ঢাকার বাদামতলী ছেড়ে সাড়ে দশটা নাগাদ অল্প সময়ের জন্য সদরঘাটে দাঁড়ায়। আমরা বরাবর সদরঘাট থেকে উঠি।

সদরঘাটকে অনেকটা হাওড়া স্টেশনের সঙ্গে তুলনা করা চলে। চারদিকে ছোট বড়ো-মাঝারি নৌকা, জাহাজ, ডিঙি, ষ্টিমার। এবং প্রত্যেক ৫/১০ মিনিট অন্তর এক একটি ষ্টিমার বা লঞ্চ ছেড়ে যাচ্ছে। চাঁদপুর, খুলনা, ভোলা, বাবুগঞ্জ, মাদারীপুর, গলাচিপা, বরিশাল। পাবলিক এ্যাড্রেস সিস্টেম এ ঘোষণা না থাকায় ঘাটের যাত্রী, খালাসী, কন্ডাকৃটর এর ডাক বুঝে উঠতে হবে। নিয়মিত যাত্রীরা অবশ্য জানে কোথায় ষ্টিমার দাঁড়াবে এবং আমাদের ট্রেনের প্ল্যাটফর্মের মতোই আগে থেকেই সবাই ভালো জায়গা বেছে নেন। ষ্টিমারের গার্ড কেবিন ও ফার্স্টক্লাসের যাত্রীদের তালিকা মিলিয়ে তাদের জায়গা দেখিয়ে দেন। কেবিন পাওয়াতে মালপত্র রাখা ও বাচ্চাদের বিশ্রাম নিতে খুব সুবিধা হয়। কেবিনগুলি ফার্স্টক্লাসের কুপের মতো। ছোটো একটা ঘর। দুদিকে দুখানা পরিষ্কার বিছানা, একটা পাখা, দেয়াল আয়না-সহ জিনিসপত্র রাখার জায়গা। সদরঘাট ছাড়ার একটু পরেই আর্দালি চা, এবং দুপুরের খাবারের অর্ডার নিয়ে যান।

ষ্টিমারের সবচেয়ে ওপরের তলায় হচ্ছে কেবিন ও ফার্স্টক্লাস। সাধারণভাবে কেবিন ও ফার্স্টক্লাসে কোনো তফাৎ নেই—ফার্স্টক্লাসে শুধু বসার জায়গা ডেকের পেছনে।

সদর ঘাটের মুখটা খুবই ঘিঞ্জি, তাই আস্তে আস্তে যেতে হয়। এইখানে বুড়িগঙ্গা খুব একটা চওড়া নয়। অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাংলাদেশের মনোরম শোভা চোখ জুড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঘনবসতি পূর্ণ দেশ, কিন্তু নদীপথে বোঝার উপায় নেই, যদি না মাঝেমধ্যে চোখে পড়ে মানুষের ভারে উপচে পড়া লঞ্চ বা নৌকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই রকেট

মেঘনায় পড়ে। অনেক জায়গায় মেঘনা এত চওড়া যে দূরের পাড় প্রায় দেখাই যায় না। ছোটো ছোটো গ্রাম, কিছু কাঁচা ও পাকা বাড়ি নদীর ধারে সারি সারি নারকোল গাছ ও ইটখোলা। তার সঙ্গে আছে নদীতে রংবেরং এর পাল তোলা নৌকা। ভালো পাল, ছেঁড়া পাল, তাপ্পি মারা পাল দেখে মনে হয় ডিজাইনটাই বোধহয় ওই রকম হওয়া উচিত ছিল প্রথম থেকেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায়। নদীর হাওয়ায় নাকি খিদে বেশি পায়, তাই বোধ হয় আর্দালিরা মাঝে মধ্যেই চা-পেঁয়াজির খোঁজ নিয়ে যান। এই সময় লোকজনের সঙ্গে আলাপ ও আড্ডা জমানো যায়।

খাবার তিন রকমের ছিল বাংলা, চিকেন ও ইংলিশ। সব প্লেটের সঙ্গেই খিচুড়ি বা ভাত থাকে।

রকেট হচ্ছে এক্সপ্রেস সার্ভিস। ঢাকা ছেড়ে ঘণ্টা তিনেক পরে দাঁড়ায় বিখ্যাত নদীবন্দর কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরে। তারপরের স্টপই বরিশাল শহর। রকেট অবশ্য বরিশালের পরে নলচিটি, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বাগেরহাট হয়ে খুলনা যায়। বরিশালে রকেট পোঁছায় ভোররাত্রে। বরিশাল থেকে খুলনা আরও ৭/৮ ঘণ্টার পথ এবং ছোট নদী দিয়ে যায়।

বরিশালে যাঁরা আগে গেছেন তাঁদের কাছে দেখার অনেক কিছুই আছে। আমাকে যে সব জায়গা লোকে দেখতে বলে তার মধ্যে আছে, সদরঘাট, ব্রজ-মোহন (বি. এম্) কলেজ, ঘাটের কাছে মস্জিদ (বিদেশি সাহায্যে এটা বড়ো করে পুনর্নির্মিত হচ্ছে)। সদর রোডের কালীবাড়ি, মুকুন্দদাসের কালীবাড়ি, স্কটিশ মিশনের গীর্জা, উইমেন্স কলেজ, রামকৃষ্ণ মিশন (এক পার্সি ভদ্রলোকের দানে তৈরি) টাউন হল, শংকর মঠ। এ ছাড়া ঘরবরণ রায়ের মিষ্টির দোকান (উনি বললেন তার দোকান বরিশাল শহরে দ্বিতীয় পুরোনো দোকান, এবং ১৯৭১ এ দোকানটা প্রথমে ভাঙচুর ও পরে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়)। বরিশাল বা খুলনা থেকে সোজা এক্সপ্রেস বাসে বনগাঁর কাছে বেনাপোল সীমান্তে আসা যায়। বরিশাল থেকে জলপথে চট্টগ্রাম, ভোলা, কুমিল্লা, নোয়াখালি, পটুয়াখালি, ফরিদপুর, সুন্দরবন যাওয়া যায় খুব সহজেই।



বৌদ্ধ মন্দির



. বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ

যদি বেড়াতে যান : চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের নাম শুনলেই স্থানীয় 'চাটগাঁই' ও অন্য বাঙালির কাছে নানা রকমের কল্পনার ছবি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। কারও কাছে এটা একটা 'বিউটি কুইন' বা সৌন্দর্য সর্বোত্তমা। অনেকের কাছে চট্টগ্রাম হচ্ছে বাংলার প্রান্ত শহর বা 'ফ্রনটিয়ার টাউন', এবং অন্য অনেকের কাছে এ হলো বিভিন্ন রকমের সৌন্দর্য মেশানো একটা জায়গা। যেখানে সমতল বঙ্গদেশ ও আরাকান পর্বতমালা একসঙ্গে মিলেছে, অনেকের কাছে এ হলো আধুনিক বিপ্লবীদের জন্মস্থান। চট্টগ্রামের খ্যাতি, এটি একটি অতি পুরাতন বন্দর, 'গ্রাণ্ড ওল্ড পোর্ট সিটি', এবং সেই সুবাদেই এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং অন্তত পাঁচ রকমের ধর্মীয় মতবাদের মিলনস্থল। চট্টগ্রামের আরও সুখ্যাতি সেখানের 'ঝাল' রান্না-খাবারের জন্য এবং এখান থেকে অল্পসময়ের মধ্যেই মাধুর্যময় পাহাড় ও ঘন বন, এবং আনন্দদায়ক স্বচ্ছ সৈকত-এ যাওয়া যায়।

চট্টগ্রাম বা চাটগাঁ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এটা শুধুমাত্র বাংলাদেশের বৃহত্তম বন্দরই নয়, এটি হচ্ছে ঢাকার পরেই বাংলাদেশের অন্যতম ব্যবসা বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, স্কুল-কলেজের কেন্দ্র। কর্ণফুলি নদীর তীরে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবস্থিত বলেই প্রায় হাজার বছর ধরেই এই জায়গা বার্মা থেকে বাংলা অসম থেকে দিল্লি, আরবদেশ থেকে ইন্দোনেশিয়া, ইংলণ্ড থেকে চীন-এর রাজা-মহারাজা মুনি-ঋষি-পীর, দয়ালু পথিক থেকে ভয়াল জলদস্যুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কথিত আছে যে, গত দশম শতকে আরব ব্যবসাদাররা তাদের পসরা নিয়ে এখানে আসেন। চীনা পথিকরা পঞ্চম শতকে চট্টগ্রাম আসেন, এবং এক ওলন্দাজ নাবিক ১৫১৭ খৃঃ চট্টগ্রাম ঘুরে যান। যখন এ জায়গা সত্যিই একটা গ্রাম ছিল। ১৮ শতকে ফরাসিরা এখানে আসেন, এবং ১৭৬০ সালের মধ্যেই চট্টগ্রাম ভারত-বিজেতা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আওতায় চলে আসে।

প্রত্যেক "চাটগাঁইরা" তাদের অতীত সম্পর্কে অত্যন্ত গর্বিত। ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ-এ (সিপাই বিদ্রোহ) চট্টগ্রামের সেনাঘাঁটির অনেকেই ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। চট্টগ্রামের প্রত্যেকে গর্বের সঙ্গে আপনাকে মনে করিয়ে দেবে যে ১৯৩০ সালে মাস্টারদা সূর্য্য সেনের

নেতৃত্বে তাঁরা কয়দিন 'স্বাধীন' ছিলেন এবং স্বাধীন ভারতের পতাকা উড়িয়েছিলেন, অন্য কোথাও সেই পতাকা ওড়ার অনেক আগেই। জালালাবাদ পাহাড়ের এই যুদ্ধে অনেকে প্রাণ হারান, ও অন্য অনেককে আন্দামানের কুখ্যাত কারাগারে জীবন কাটাতে হয়। যাঁরা সেদিন দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, হরি বল, মতি কানুনগো, নির্মল লালা, পুলিন ঘোষ, বিধু ভট্টাচার্য, অর্ধেন্দু দস্তিদার, ও আরও অনেক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধও এই চট্টগ্রাম থেকেই আরম্ভ হয় ২৬ মার্চ পরলোকগত (পরে রাষ্ট্রপতি ও জেনারেল) জিয়া-উর রহমানের দীপ্ত ভাষণের মধ্য দিয়েই।

বেশ কয়েকরকম ভাবেই চট্টগ্রামে যাওয়া যায়। সবচেয়ে সোজা হলো ঢাকা থেকে যাওয়া। অন্তত চার রকম ভাবে ঢাকা থেকে যাওয়া যায় ; জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে এবং হাতে কত সময় আছে এবং কত খরচা করতে চান্ তার ওপর এটা নির্ভর করবে। এক নম্বর হলো বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর বেশ কয়েকটা একঘণ্টার ফ্লাইট আছে ঢাকা থেকে। ঢাকায় প্লেনে সরাসরি কলকাতা, বম্বে, ব্যাংকক, কাঠমাণ্ডু ও ইউরোপ ও এশিয়ার অনেক জায়গা থেকেই যাওয়া যায়। প্লেনে যাওয়া খরচ সাপেক্ষ। তা বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয়ত, সবচেয়ে জনপ্রিয় হল দূরপাল্লার বাসে যাওয়া (কোচ সার্ভিস)। ঢাকা ও চট্টগ্রামের বাস স্ট্যাণ্ড থেকে প্রত্যেক ১৫-২০ মিনিট অন্তর এই বাস ছাড়ে, এবং ১৬৫ মাইল যেতে লাগে প্রায় ছয় ঘণ্টা। ফেরিতে ট্রাফিক জ্যাম (যানজট) ও জোয়ার-ভাঁটার ফলে এই সময় বেশি লাগতে পারে। খরচা পড়বে বাংলাদেশের ৫০-৬০ টাকার (মার্কিন দু ডলার) মতো। তৃতীয়ত যা আমার প্রিয় তা 'আন্তঃ নগরী' সুন্দর সুন্দর নামের 'পাহাড়িকা' 'গোধূলি' ট্রেন। এই রকম কয়েকটা এক্সপ্রেস ট্রেন সার্ভিস আছে (তা' আবার বন্ধ করার কথা হচ্ছে), এবং এতেও প্রায় বাসের মতোই সময় ও অর্থ লাগে। ট্রেনগুলো বোধ হয় পশ্চিমবাংলার ট্রেনের থেকে ভালো পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। আর চতুর্থ উপায় হলো জলপথে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের মনোরম শোভা উপভোগ করতে করতে যাওয়া। তবে এতেও প্রায় দুদিন সময় লাগবে, এবং দক্ষিণ বাংলার বরিশাল, রামগতি, ভোলা বা অন্য কোনো বন্দর-শহরে জাহাজ (লঞ্চ বা স্টিমার) পাল্টাতে হবে। ট্রেনে বা জাহাজে যাওয়ার একটা উপরি-লাভ আছে। সেটা হলো সাধারণ মানুষের সান্নিধ্য পাওয়া। খুব কম দেশের লোকেরাই এত অল্প সময়ের মধ্যে দূরের মানুষকে কাছে টেনে নিতে পারে।



চট্টগ্রাম - কর্ণফুলি নদী ও তার পশ্চাৎ   শ্যাল বিল্ডিং (কোর্ট হিল)



চট্টগ্রাম - পাটেঙ্গা বীচ

কলকাতা থেকে যদি কেউ সরাসরি চট্টগ্রাম যেতে চায় তো তাদের জন্য রয়েছে কলকাতা-চট্টগ্রাম উড়োজাহাজ। বাংলাদেশ বিমান ও ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স মাত্র ৪৫ মিনিটে চট্টগ্রাম পৌঁছে দেবে। ১৯৪৭ এর ভারত ও বঙ্গ-বিভাগের আগে কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার আরেকটা পথ ছিল। সেটা হলো বঙ্গোপসাগরের উন্মুক্ত সমুদ্রের মধ্য দিয়ে সমুদ্রগামী জাহাজে এই পথ অতিক্রম করা। লোকমুখে এইভাবে চট্টগ্রাম আসা-যাওয়ার ওপরে অনেক উপভোগ্য কাহিনী শুনেছি। আগে চট্টগ্রামের সঙ্গে বার্মার স্থলপথেও ভালো যোগাযোগ ছিল; কিন্তু আজকাল বার্মা থেকে যাওয়া আসা প্রায় বন্ধই বিশেষত টুরিস্টদের জন্য।

চট্টগ্রামকে অনেকেই বাংলাদেশের 'বিউটি কুইন' বলে। অর্থাৎ সৌন্দর্যের রানী। সেটা তো আর লোকে এমনিই বলে না, নিশ্চয়ই কারণ আছে। চট্টগ্রামই বোধ হয় এক মাত্র 'বাঙালি' শহর যা পুরোপুরি সমতল নয়। শহরের মধ্যেই বেশ কয়েকটা পাহাড় বা 'হিল' আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে নামকরা হলো 'বাটালী হিল' (Battali Hill)। বাটালীর ওপরে দাঁড়ালে সারা শহরকে সুন্দর ভাবে দেখা যায়। কোর্ট হিল (Court Hill) এর মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং এর ওপর থেকে শহরের সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখা যায়। বিশেষত কর্ণফুলী নদীর অন্য তীরটি। এই বাড়ি ইংরেজ আমলেই তৈরি।

চট্টগ্রাম শহরে অনেক ঐতিহাসিক, নামী-দামি জায়গা ও বাড়ি আছে। শহরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলো হলো শহিদ মিনার (১৯৫২), শা আমানতের দরগা (১৯ শতক), জামে মসজিদ (১৬৬৮), নন্দন কানন, বৌদ্ধ মন্দির, চট্টেশ্বরী মন্দির, সদরঘাট কালী মন্দির, কদম মোবারক মসজিদ (১৭১৯), তুলসীধাম আশ্রম ব্রাহ্ম মন্দির, বেথলেহম গির্জা, সেণ্ট মেরী গির্জা, চন্দ্রপুরা মসজিদ, মদিনা মসজিদ, সূর্য্য সেন স্মৃতিসৌধ, এথনোলাজিক্যাল যাদুঘর ও বিমান বন্দরের কাছে পতেঙ্গা সৈকত। এ ছাড়া আরও অনেক দেখার জায়গা আছে। যদি কেউ স্কুল কলেজে উৎসাহী হয়, তো তার জন্য রয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।

সাধারণত চট্টগ্রাম শহরে যাঁরা যান তাঁরা শুধু কিছু সময় শহরে কাটিয়েই ফিরে আসেন না। ধারে কাছে প্রচুর আকর্ষণীয় জায়গা আছে। বিশেষত পাহাড় ও সৈকত। পার্বত্য চট্টগ্রাম-এ আকর্ষণীয় জায়গার মধ্যে আছে রাঙামাটি, কাপতাই, খাগরাদরি, বন্দরবান। বঙ্গোপসাগরের সৈকত বা বীচ এর মধ্যে যে-গুলোর বেশ নাম তার মধ্যে আছে কক্স বাজার, টেকনাফ, সোনাদিয়া দ্বীপ, সেণ্ট-

মার্টিন দ্বীপ, (St. Martin)। এই সব জায়গায় একটা গাড়ি ভাড়া করে যাওয়া যায় (যার খরচা একটু বেশি), অথবা অল্প পয়সা খরচ করে স্থানীয় বাসে যাওয়া যায়। যে কোনো হোটেল বা টুরিস্ট অফিস এর হদিস দিতে পারবে।

আমি যে দেশেই যাই সেখানে খাওয়া-দাওয়ার বিশেষত্ব উপলব্ধি না করে আসি না। ভারতীয় খাবারের মধ্যে বাংলা খাবারের এক বিশেষ স্থান আছে। বাংলা-খাবারের মধ্যে চট্টগ্রামের খাবারেরও এক বিশেষ স্থান আছে। বিশেষত তার লাল ঝাল লংকা-শুঁটকী মাছের কল্যাণে। সাধারণভাবে লোকেরা হয় 'লাভ ইট অথবা হেট ইট' করে থাকে। হয় অতি ভালোবাসে বা অতি খারাপ বলে। কারুর কাছেই 'মোটামুটি' ব্যাখ্যা পাইনি 'চাঁটগা' খাবারের। প্রায় সব বড়ো হোটেলেই বাংলা খাবার পাওয়া যায়, তবে 'চাটগাঁ' খাবার পেতে হলে অবশ্য স্পেশাল অর্ডার দিতে হবে, নতুবা ছোট ছোট রেস্তরাঁয় যেতে হবে।

চট্টগ্রামে এখন অনেক অল্প ও বেশি খরচের নামী-দামি হোটেল আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে নাম করা হলো আগ্রাবাদ হোটেল। স্টেশনে, বন্দরে বা এয়ার-পোর্টে নেমেও হোটেলের খোঁজ করলে লোকেরা বলে দিতে পারবেন।

একবারে চট্টগ্রামের সব কিছু উপভোগ করা মুশকিল। যদি কেউ একবারও যান তবে তাঁর স্মৃতির কোঠায় কোনো না কোনো জিনিস আটকে থাকবেই। সে তার "লাল-ঝাল" খাবার, বা তার ঐতিহাসিক স্মৃতি সৌধগুলো, অথবা তার সুদৃশ্য পর্বতমালা, বা তার 'এণ্ডলেস বীচ', সুদূর প্রসারী সৈকত ভূমি, অথবা সেখানের মানুষেজনের বন্ধুত্ব।

———

গ্রন্থপঞ্জী

আনসারী, ইকবাল এ (সম্পাঃ) ঃ দি মুসলিম সিচুয়েশন ইন ইণ্ডিয়া, একাডেমিক প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৯।

আলমগীর মুহিউদ্দিন খান (সম্পাঃ) ঃ ল্যাণ্ড রিফর্ম ইন বাংলাদেশ, সেনটার ফর সোসাল স্টাডিজ, ঢাকা ; ১৯৮১।

আহমেদ এমাজুদ্দীন ঃ ব্যুরোক্রাটিক এলিটস্ ইন সেগমেণ্টেড ইকনমিক গ্রোথ ঃ বাংলাদেশ এণ্ড পাকিস্তান, ইউনিভারসিটি প্রেস লিঃ, ১৯৮০।

আহমেদ শরীফ উদ্দিন ঃ ঢাকা, কারজন প্রেস, লণ্ডন ; ১৯৮৬।

আহাদ অলি ঃ জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৫-৭৫, বর্ণরূপা মুদ্রায়ন, ঢাকা ; ১৯৮৩।

ইনজিনিয়ার আসগার আলি (সম্পাঃ) ঃ কমিউন্যাল রায়টস্ ইন পোস্ট ইণ্ডিপেন-ডেন্স ইণ্ডিয়া, সঙ্গম, হায়দ্রাবাদ ; ১৯৮৪।

ইসলাম, নুরুল ঃ ডেভলপমেণ্ট প্ল্যানিং ইন বাংলাদেশ, ইউনিভারসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ; ১৯৭৯।

ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল (সম্পাঃ) ঃ বাংলাদেশ—বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা ; ১৯৯০।

উমর বদরুদ্দীন ঃ সাম্প্রদায়িকতা, মুক্তধারা, ঢাকা ; ১৯৮৭।

———— সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা, মুক্তধারা, ১৯৮০।

———— পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খণ্ড, ইডেন প্রেস, ঢাকা ; ১৯৭০।

———— পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, দ্বিতীয় খণ্ড ; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ; বাংলা ১৩৮২।

———— পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট, নবজাতক প্রকাশনী, কলিকাতা ; ১৯৭১।

———— বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক, মুক্তধারা, ঢাকা ; ১৯৮৫।

———— যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ, মুক্তধারা, ঢাকা ; ১৯৮৮।

———— যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৭।

উইলসন, এ. জেয়ারত্নম ও ডালটন, ডেনিস (সম্পাঃ) ঃ দি স্টেটস্ অব সাউথ

এশিয়া : প্রবলেমস অব গ্যাশনাল ইন্‌টিগ্রেসন ; সি. হারমট এণ্ড কোং. লণ্ডন , ১৯৮২ ।

কবীর মহম্মদ গুলাম : মাইনরিটি পলিটিকস্ ইন বাংলাদেশ, বিকাস, নতুন দিল্লি ; ১৯৭৬ ।

কামাল, সুদিয়া : একাত্তরের ডায়েরী, জ্ঞান প্রকাশনী, ঢাকা ; ১৯৮৯ ।

খান, জিল্লুর আর : লিডারশিপ ইন দি লিস্ট ডেভেলপট্‌ নেশন : বাংলাদেশ. সিরাকিউজ ইউনিভারসিটি, নিউ ইয়র্ক ; ১৯৮৩ ।

গফুর, অধ্যাপক আব্দুল : আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়বাংলা, ঢাকা বুক মার্ট, ঢাকা ; ১৯৭৩ ।

গারদেজি. হাসান ও রশিদ, জামিল : পাকিস্তান দি রুট্‌স অব ডিক্টেটরশিপ, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, দিল্লি ; ১৯৮৫ ।

গোলাম সাকলায়েন : অন্তরঙ্গ আলোকে ডক্টর শহীদুল্লাহ, আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ; ১৯৭০ ।

গুণ নির্মলেন্দু : দেশান্তর, মুক্তধারা, ঢাকা ; ১৯৮৪ ।

ঘোষ অমলেন্দু : ভারতে কমিউনিজম, পূর্ণ প্রকাশন, কলকাতা ১৯৮৬ ।

ঘোষ শঙ্কর : ওয়েষ্ট বেঙ্গল টুডে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা ১৯৭৬ ।

চন্দ্র বিপান : কমিউনালিজম ইন মডার্ন ইণ্ডিয়া ; ভিকাস, নতুন দিল্লি ; ১৯৮৭ ।

চক্রবর্তী এস, আর : বাংলাদেশ : দি ১৯৭৯ ইলেকশনস, সাউথ এশিয়ান পাবলিশার্স, নতুন দিল্লি ; ১৯৮৮ ।

চাকমা সিদ্ধার্থ : প্রসঙ্গ : পার্বত্য চট্টগ্রাম. নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা ;

চট্টোপাধ্যায় গৌতম : বেঙ্গল ইলেকটোরাল পলিটিক্স এণ্ড ফ্রিডম স্ট্রাগল্, ১৮৬২-১৯৪৭, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিসটোরিক্যাল রিসার্চ, নতুন দিল্লি ; ১৯৮৪ ।

চাকলাদার স্নেহময় : ভারতের জাতব্যবস্থা ও রাজনীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা ; ১৯৮৭ ।

চোপরা প্রাণ ও অন্যান্য : ফিউচার অব সাউথ এশিয়া, ম্যাকমিলান, নতুন দিল্লি ১৯৮৬ ।

চৌধুরী সি, নীরদচন্দ্র : আত্মঘাতী বাঙালী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা , ১৯৮৯ ।

——— দি অটোবাওগ্রাফী অব এ্যান আননোন ইণ্ডিয়ান, ইউনিভারসিটি প্রেস অব ক্যালিফোর্ণিয়া, বার্কলে ; ১৯৬৪ ।

জাহান রুনক : বাংলাদেশ পলিটিক্স : প্রবলেম্‌স এণ্ড ইস্যুজ, ইউনিভারসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ; ১৯৮৭।

ডেভিস মরভিন : বেঙ্গল স্টাডিস ইন লিটরেচর, সোসাইটি এণ্ড হিস্ট্রি, মিশিগান স্টেট ইউনিভারসিটি, ইস্ট ল্যান্সিং ; ১৯৭৬।

থর্প জন (সম্পাঃ) : উইমেন, ডেভেলপমেণ্ট, ডিভোশনালিজম, ন্যাশনালিজম বেঙ্গল স্টাডিজ ১৯৮৫। মিশিগান ইউনিভারসিটি ইস্ট ল্যান্‌সিং ; ১৯৮৬।

দস্তিদার সব্যসাচী এবং দস্তিদার শেফালী এস. : রিজিওন্যাল ডিসপারিটিস এণ্ড রিজিওন্যাল ডেভেলপ্‌মেণ্ট প্ল্যানিং অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, ফার্মা, কে, এল, এম, কলকাতা ; ১৯৯১।

দাস অমিয় : আসামস্‌ এগনি : এ সোশিও ইকনমিক এণ্ড পলিটিক্যাল এ্যানালিশিস, ল্যানসারস্‌, নতুন দিল্লি ; ১৯৮২।

দে অমলেন্দু : বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা ; ১৯৮৭।

নিয়োগী, অজিত, কে : পার্টিশনস্‌ অব বেঙ্গল : এ মুখার্জী, কলকাতা, ১৯৮৭।

পটল হলধর : ময়না তদন্ত, শিবরাণী প্রকাশন, কলকাতা ; ১৯৮৫।

পার্ক রিচার্ড এল (সম্পাঃ) : প্যাটার্নস অব চেঞ্জ ইন মডার্ন বেঙ্গল, মিশিগান স্টেট ইউনিভারসিটি, ইস্ট ল্যানসিং ; ১৯৭৯।

ফারুকী রশীদ আল : মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া, রত্না প্রকাশন, কলকাতা ; ১৯৮১।

ফাল্যাণ্ড, জাস্ট ও পারকিনসন : জে আর বাংলাদেশ : দি টেস্ট কেস ফর ডেভেলপমেণ্ট, ওয়েষ্ট ভিউ প্রেস, কলোরাডো ; ১৯৭৬।

বন্দ্যোপাধ্যায় আলাপন (সম্পাঃ) : প্রসঙ্গ গোর্খাল্যাণ্ড ; আনন্দ, কলকাতা ; ১৯৮৭।

বসু কালিপদ : ওয়েস্ট বেঙ্গল ইকনমি, ফার্মা কে, এল, এম, কলকাতা : ১৯৭৯।

বসু দক্ষিণারঞ্জন : ফেলে আসা গ্রাম, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।

বাংলাদেশ রুরাল ডেপেলপমেণ্ট কমিটি : হু গেটস্‌ হোয়াট এণ্ড হোয়াই, বি. এ. আর. সি, কুমিল্লা ; ১৯৭৯।

বাংলাদেশ সরকার : স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক অব বাংলাদেশ, ১৯৮৩-৮৪ ; ঢাকা।

———— মিট বাংলাদেশ, ঢাকা ; ১৯৮৭।

——— বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস, ১৯৮১, ঢাকা ; ১৯৮৪।

——— উপজেলা স্ট্যাটিসটিক্স, ঢাকা ; ১৯৮৫।

——— উপজেলা স্ট্যাটিসটিক্স অব বাংলাদেশ, ঢাকা ; ১৯৮৮।

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ : সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও নিপীড়নের কিছু তথ্য, ঢাকা ; ১৯৮৯।

——— সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও নিপীড়নের কিছু তথ্য, দ্বিতীয় পর্যায়, ঢাকা ; ১৯৯০।

বোস নিমাইসাধন : রেশিজম, স্ট্রাগল ফর ইকুয়েলিটি এণ্ড ইণ্ডিয়ান ন্যাশালিজম ফার্মা কে, এল, এম, কলকাতা ; ১৯৮১।

ব্রুমফিল্ড জন : মোষ্টলী এবাউট বেঙ্গল, মনোহর, নতুন দিল্লী, ১৯৮২।

ভট্টাচার্য্য এস, আর : ট্রাইবাল ইনসারজেন্সি ইন ত্রিপুরা, ইন্টার-ইণ্ডিয়া, নতুন দিল্লি : ১৯৮৯।

ভট্টাচার্য্য বুদ্ধদেব (সম্পা:) : ফ্রিডম স্ট্রাগল এণ্ড অনুশীলন সমিতি, অনুশীলন ; কলকাতা।

ভারত সরকার : সেনসাস অব ইণ্ডিয়া, ১৯৭১ : ওয়েষ্ট বেঙ্গল, নতুন দিল্লি।

মণিরুজ্জামান, তালুকদার : গ্রুপ ইনটারেস্ট এণ্ড পলিটিক্যাল চেনজেস : স্টাডিজ অব পাকিস্তান এণ্ড বাংলাদেশ, সাউথ এশিয়ান পাবলিশার্স, নতুন দিল্লি ; ১৯৮২।

মামুন মুনতাসীর ও রায় জয়ন্তকুমার : ইনসাইড ব্যুরোক্রাসী : বাংলাদেশ, প্যাপিরাস কলকাতা, ১৯৮৭।

মালিক যোগেন্দ্র : সাউথ এশিয়ান ইনটালেকচুয়ালস এণ্ড সোশাল চেঞ্জ সাউথ এশিয়া বুকস, মিসৌরী ; ১৯৮২।

মুখার্জি পার্থ, এন : ফ্রম লেফ্‌ট এক্সট্রিমিজিম টু ইলেকটোরাল পলিটিক্স, মনোহর, নতুন দিল্লি ; ১৯৮৩।

রহমান মতিউর ও হক সৈয়দ আজিজুল : বৈষম্যের শিকার বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়, জ্ঞান প্রকাশনী, ঢাকা ; ১৯৯০।

রহিম এম, এ : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৪৭, ইস্টার্ণ প্রিন্টিং, ঢাকা ; ১৯৭৬।

রক্ষিত মৃদুলকান্তি : দি ল অব ভেসটেড প্রপারটিস ইন বাংলাদেশ, ডিলাক্স প্রিন্টিং প্রেস, চট্টগ্রাম ; ১৯৮৯।

রায় রণজিৎ : ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ, শঙ্খ প্রকাশন, কলকাতা ; ১৯৭৩।
———— দি এগনি অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল ; নিউ এজ কলকাতা : ১৯৭৩।
রায় বিশ্বনাথ : পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমীক্ষা, মডার্ন বুক এজেন্সী কলকাতা ১৯৮৮।
লা পিয়ের ডমিনিক : দি সিটি অব জয়, ওয়ারনার বুক্স ; নিউ ইয়র্ক ; ১৯৮৫।
লাউসে ডেভিড : বেঙ্গল টেররিজম এণ্ড মার্কসিস্ট লেফ্‌ট্, ফর্মা, কে, এল, এম, কলকাতা ১৯৭৫।
শোভান, রেহমান : দি ক্রাইসিস অব এক্সটারনাল ডিপেন্‌ডেন্টস্ : স্টাডিজ অফ পাকিস্তান এণ্ড বাংলাদেশ, দি ইউনিভারসিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা ; ১৯৮২।
সাত্তার মহম্মদ, এ : এইড অর স্ট্যাগনেশন, ইউনিভারসিটি প্রেস, ঢাকা ; ১৯৮৭।
সেন অনুপম : বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সমাজ, সাহিত্য সমবায়, ঢাকা ; ১৯৮৮।
সেন রঙ্গলাল : পলিটিক্যাল এলিটস্ ইন বাংলাদেশ, ইউনিভারসিটি প্রেস, ঢাকা ; ১৯৮৬।
সেন শীলা : মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল ১৯৩৭-১৯৪৭, ইমপেক্স, নতুন দিল্লি, ১৯৭৬।
সিদ্দিকী এম, কে, এ : মুসলিমস অব ক্যালকাটা, এনথ্রপলিজিক্যাল সারভে অব ইণ্ডিয়া, কলকাতা ; ১৯৭৯।
সিদ্দিকী কাদের : স্বাধীনতা '৭১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ; ১৯৮৫।
সুর ড. অতুল : বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, সাহিত্যলোক, কলকাতা ; ১৯৮৬।
স্টুয়ার্ট, টোনি (সম্পা:) : সেপিং বেঙ্গলি ওয়ার্লডস : পাবলিক এণ্ড প্রাইভেট, মিশিগান স্টেট ইউনিভারসিটি, ইষ্ট ল্যানসিং ; ১৯৮৭।
হক্ এম, আমিরুল (সম্পা:) : এক্সপ্রয়টেসন এণ্ড দি রুরাল পুওর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা ; ১৯৭৮।
হক মহ: সামসুল : ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা, বইঘর, চট্টগ্রাম ; ১৯৮৯।
হালদার গোপাল : সংস্কৃতির রূপান্তর, মুক্তধারা, ঢাকা ; ১৯৮৪।
———— বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রথম খণ্ড) মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৫।
———— ঐ (দ্বিতীয় খণ্ড), মুক্তধারা, ঢাকা ; ১৯৮৬।